ক্ষুদ্রক-পাঠ

ভিক্ষু সত্যপাল

গ্রন্থ-শীর্ষ : ক্ষুদ্রক-পাঠ

গ্রন্থকার : অধ্যাপক ডঃ ভিক্ষু সত্যপাল

প্রকাশিকা : দীপু বড়ুয়া
মাল দক্ষিণ কলোনী, পো. মাল বাজার
জেলা: জলপাইগুড়ি, প. ব.
পিন কোড নং: ৭৩৫২২১
দূরাভাষ নং : ০৩৫৬২ - ২২৮৭৬

প্রকাশ-কাল : ১০/ ০২/ ২০০৯

সংস্করণ : প্রথম, ১০০০ কপি

কম্পোজিং ও ডিজাইনিং : শ্রী সরিৎ বড়ুয়া

কপি-রাইট : গ্রন্থকার (সর্বাধিকার)

মুদ্রক : সাঁচী প্রেস, দিল্লী
দূরভাষ: ৪২১৪১৪৫৭; ৯৩১১৭৯০৫০৪

অস্থায়ী বাসস্থান : C-II (29 - 31), Chatra Marg,
University of Delhi
Delhi – 110007 (India)
Tele: 011 – 27667003
Email: bhikshusatyapala@live.com
bhantesatyapala@gmail.com
buddhatriratnamission@yahoo.com

Printed for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

সমর্পন-পত্র

'ক্ষুদ্রক-পাঠ'

শীর্ষক গ্রন্থটি

আমার ভাই ঁউত্তম বড়ুয়া ও

ভ্রাতৃ-বধু ঁসাধনা বড়ুয়ার

(ঋতুরাজ ও বর্ষা বড়ুয়ার বাবা-মা)

স্মৃতি-রক্ষার্থে

সমর্পিত হল

!

গ্রন্থকার

ভিক্ষু সত্যপাল

Suniti Kumar Pathak,
(M.A., P.R.S.)
Kavyatirtha, Sutta-Visarada, Puranaratna
Diploma in Chinese
Former Chairman
Department of Indo-Tibetan Studies
Visva-Bharati University (Retd.)
Ex-Research Professor
The Asiatic Society, Kolkata.

Residence:
Akash-Deep, Abanpalli
Santiniketan- 731235
West Bengal
Phone 03463-262508

পুরোবাক্

আজকাল বাঙালী বৌদ্ধদের কাছে বাঙ্‌লাভাষায় বুদ্ধবচনের সংগ্রহ অত্যন্ত প্রয়োজনের হয়ে পড়েছে। চট্টগ্রামের বৌদ্ধমনীষীরা ঊনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম পাদ অবধি যে উৎসাহ নিয়ে বাঙ্‌লাভাষায় বুদ্ধবচনের সংগ্রহ বাঙালী পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তা বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাবার পর নানা কারণে ম্লান হয়ে গেছে। তার পিছনে বাঙালী বৌদ্ধদের আর্থসামাজিক কথা এসে পড়ে। ফলে নূতন প্রজন্মের কাছে বুদ্ধবচনের সত্যিকার পরিচয় কি তা জানার সুযোগ ঘটছে না। তারা বৌদ্ধ বলে নিজেদের পরিচয় দিলেও ভগবান বুদ্ধ কেমন করে তাঁর শিক্ষাপদ সাধারণ মানুষের কাছে তখনকার দিনের প্রচলিত ভাষায় রেখে গেছেন- সেকথা জানতে তারা কুতূহলী।

সৌভাগ্যের কথা, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ বিদ্যা বিভাগের ভার-প্রাপ্ত প্রধান প্রফেসর ভিক্ষু সত্যপাল বুদ্ধবচনের বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য বাঙ্‌লা ভাষায় অনুবাদ করে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। সেজন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই। তাঁর 'তেলকটাহ গাথা' বাঙালীদের কাছে সুপরিচিত শুধু নয়, জনপ্রিয়ও। এই ক্ষুদ্রক

গাথা বইটি তেমনি সম্ভাবনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রফেসর ডক্টর ভিক্ষু সত্যপালের বড় কুশলতা হল চলতি বাঙলায় তিনি পালিভাষার শক্ত শক্ত পদগুলির সাবলীল ও সুললিত ভাবে রূপান্তর করেন। যেমন নিধিকণ্ডসুত্তের কিছুটা উদ্ধরণ করলে তা স্পষ্ট হয়। পালিতে আছে-

অসাধারণমঞ্ঞেঞ্ঞসং অচোরহরণো নিধি।
কয়িরাথ ধীরো পুঞ্ঞানি, যো নিধি অনুগামিকো।।

বাঙলায় তর্জমা হোল

এ নিধি অসাধারণ নিধি। এর উপর অন্যের অধিকার থাকে না। চোরেও তা চুরি করতে পারে না। হে পণ্ডিত ব্যক্তি, এমন অনুগামী (পুণ্য) নিধি সঞ্চয় কর।

অনুবাদের ভাষা শুধু নয় অনুবাদ-শৈলীর নিরিখে ভদন্ত সত্যপাল ভিক্ষুর একটি বিশেষত্ব নজরে পড়ে। তা তাঁর অনুদিত মেত্ত-সুত্তের ছত্রে ছত্রে ফুটে রয়েছে। মেত্ত-সুত্ত বৌদ্ধ মাত্রের অতি প্রয়োজনীয় সুত্ত। প্রতিদিন সকালে প্রার্থনায় বসে ত্রিশরণ-পাঠের পর চিত্ত পরিশুদ্ধির ক্রমে পাপানুশোচনা ও পুণ্যানুমোদনা করতে হয়। তারপর বিশুদ্ধ চিত্তে বুদ্ধবন্দনা, ধর্মবন্দনা ও সংঘবন্দনা। পুণ্যানুমোদনার সাবলীল মার্গ মঙ্গলসুত্ত পাঠ ও মেত্তসুত্ত পাঠ। সবার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা ও মৈত্রী করাই তো ত্রিশরণমন্ত্রের যথার্থ প্রয়োগ।

এগুলি ক্ষুদ্রকপাঠের বিষয়-বস্তু। ক্ষুদ্রকপাঠ পালি সুত্তপিটকের পঞ্চম ভাগ খুদ্দকনিকায় তথা ক্ষুদ্রকনিকায়ের একটি স্বনির্ভর শিক্ষাপদ। এবিষয়ে গ্রন্থকার তাঁর বিস্তারিত ভূমিকায় প্রাঞ্জল করে সেই সত্য পালন করেছেন। সার্থক হয়েছে তাঁর প্রব্রজিত শুভনাম ভিক্ষু সত্যপাল।

ভূমিকা ছাড়াও ক্ষুদ্রক-পাঠ মাহাত্ম্যে বিস্তার ভাবে ঐ ধর্মসংগ্রহের

নয়খানি সংরচনের পরিচয় দিয়েছেন। যেগুলি সুখপাঠ্য শুধু নয় বহু তথ্যেও ভরপুর। যেমন বৌদ্ধমাত্রকে ত্রিশরণ নিতে হয়। তিনি ভারতের হোন। বাংলাদেশের হোন, শ্রীলঙ্কার বা জাপানের অথবা চীনের হোন না কেন। কেন এই ত্রিশরণ নেওয়া? এ কি কেবল প্রথা? তা নয়। মানুষ দৃশ্যমান পরিবর্তনশীল জগতের আর পাঁচটা প্রাণিসত্ত্বের মত একটি সত্ত্ব মাত্র। যখন মানুষেরা জগতের নানা ধরণের বাধা-বিপত্তির আমনা সামনি হয়ে চলে তখন মানুষ বুঝতে পারে যে তার পাশে কেউ নেই। তাই একজনের শরণ নিতে হয়। তা কোনো অশরীরী জীবসত্ত্ব নয়। এমন একজনের শরণ নেওয়া দরকার যিনি সকল মানুষের মনের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অসহায়তা দূর করতে বল দেন। কেন না, বৌদ্ধমতে ঈশ্বর বলে কোন বিশেষ সত্ত্ব নাই। চিত্তের আত্মদীপ অবস্থায় আলোকময় যিনি তিনিই দেব। তাই শাক্যবংশের গৌতমকে বুদ্ধদেব বলি।

কেউ কেউ মনে করেন দেবেরা অরূপ জগতের সত্ত্ব। তাঁদের কাছে অরূপলোক বলতে এই বিশ্বচরাচরের বাইরে কোনো এক লোক বলে অনুমিত হয়। আলোকময় সত্ত্বের রূপ থাকে না। যা বস্তুময় যা বিষয়গত তারই রূপ আছে। যার বস্তু-সত্তা নাই আর বিষয়-রূপ নাই, তা তো অরূপ জগতের। জগতের কেন না অরূপ-ধ্যানে তাঁদের সন্ধান মিলে। নূতন অনুচ্ছেদ আত্মদীপে আলোকিত হওয়ার কথা লেখায় যত সহজ বাস্তবে তা নয়। ভগবান বুদ্ধের মতে সমতা-যোগে সত্ত্বমাত্রের নিজের আলোতে নিজেই আলোকময় হতে পারে। সমতাযোগ বুদ্ধদেবের এক আবিষ্কার। বুদ্ধ হবার আগে বিরাগী ঘরছাড়া গৌতম পথে পথে অন্ধকারের ভিতর হাতড়ে বেড়িয়ে ছিলেন। কোথাও আলোর রেখা ফুটে ওঠেনি। পথে ঘাটে আকাশে বাতাসে এত বিষমতা, এত বৈরিতা, এত ভেদবিভেদ যে গৌতম সব

কিছুকে অন্ধকারময় বোধ করেছিলেন। তখান তাঁর বোধ হয়ে ছিল কেউ সহায় নাই, যার শরণ নেওয়া যেতে পারে। যাকে 'নাথ' বলা যায়। ধীরে ধীরে নিজের ভিতরে আলোর রেখা ফুটে উঠেছিল **'অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া'**, 'নিজেই নিজের নাথ, অপর কে নাথ হতে পারে?' সেই মতে নিজেকে ঠিক মতো করে চালালে দুর্লভ যে নাথ তাকেই লাভ করা যায়। সমগ্র বুদ্ধবচন ও বৌদ্ধশাস্ত্র জানলে সেই কথা জানা যায়। 'সমতা' এই বিষম জগতে একমাত্র শরণ। তার সঙ্গে কেমন করে যোগ স্থাপন করা যায় তা নিয়ে ক্ষুদ্রক-পাঠের অবশিষ্ট আটটি বিষয় বস্তু। সেগুলির পরিচয় ভদন্ত সত্যপাল সুগম ভাষায় বলেছেন। পুনরুক্তির দরকার নাই।

শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সত্যপাল তাঁর অক্লান্ত জীবনচর্চার অঙ্গ হিসাবে একটা সত্য স্মৃতিতে বহন করে চলেছেন **'ধম্মদানং সেট্‌ঠদানং'**। বুদ্ধদেবের অমোঘ ধর্মকথার অন্যতম ভাণকের এই মহান প্রয়াস সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে আদরের হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্রক-পাঠের বহুল প্রচার হলে বিশেষ করে যাঁরা বাঙলা ভাষা জানেন তাঁরা লাভবান হবেন। এই আমার বিশ্বাস। ভদন্ত ভিক্ষু সত্যপালের প্রয়াস সার্থক হোক, এই নিবেদন।

তারিখ : ১৬/০৫/২০০৮ সুনীতি কুমার পাঠক

ভূমিকা

বুদ্ধবাণী ও পিটক

মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর রাজগৃহে আয়োজিত প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে শ্রদ্ধেয় মহাকাশ্যপ মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে এবং শ্রদ্ধেয় আনন্দ ও উপালি প্রমুখ পাঁচ শত অর্হৎ পণ্ডিত স্থবির-মহাস্থবিরগণের উপস্থিতিতে তথাগত বুদ্ধের মুখনিসৃত সমগ্র বাণীর সংরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রথমবার সংগ্রহিত ও সংকলিত হয়। বুদ্ধবাণীর ও আবৃত্তিকারীর পরিশুদ্ধিতা রক্ষার উদ্দেশ্যে নানা শ্রেণীতে এর বর্গীকরণ করা হয়। বুদ্ধবাণীর এক শ্রেণীকে 'ত্রিপিটক' সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

'পিটক' শব্দের মূল অর্থ হল পিটারা, পেটি, মঞ্জুসা, বাক্স, ঝুড়ি আদি। এই 'পিটক' এর প্রয়োগ মুখ্যত দুটি উদ্দেশ্যে করা হয়। এ দুটি হল- প্রথমত কোন আবশ্যক তত্ত্বকে যথাবৎ অধিককাল সুরক্ষিত রাখা; আর দ্বিতীয়ত, এক স্থান হতে অন্য স্থানে কোন আবশ্যক তত্ত্বকে সুরক্ষিতভাবে স্থানান্তরিত করা।

সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর যাবৎ বর্ষাধারার ন্যায় যত্র তত্র সর্বত্র বর্ষিত অমৃতধারা বুদ্ধবাণী সংগ্রহীত ও সুসংকলিত হওয়ায় তা তাঁর শিষ্যশিষ্যাসমূহের (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সংঘের) কাছে সহজে স্মরণ-যোগ্য ও সুপাঠ্য হয়। লিপিবদ্ধ না থাকায় মুখপাঠ- পরম্পরার প্রচলন হয়। দুলর্ভ বুদ্ধবাণীকে এভাবে সুরক্ষিত রাখার আর মুখ-পাঠের পরম্পরার মাধ্যমে ত্রিরত্নের ভাবী ধারক-বাহক শিষ্যানুশিষ্যের কাছে অবিচ্ছিন্ন ও সুরক্ষিতভাবে হস্তান্তরিত করার কাজে বুদ্ধবাণীর এ সুসংকলনকে 'ভাজন' অর্থে 'পিটক' সংজ্ঞা দেয়া হয়।

'পিটকে' সংগ্রহীত বুদ্ধবাণী কোন এক বিশেষ কালের, বিশেষ স্থানের

কোন ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে দেশিত হয় নি। শাস্তা তাঁর বুদ্ধচর্যা অনুশীলন-কালে তদ্‌কালীন বিশাল জম্বুদ্বীপের মধ্যমমণ্ডলের গ্রাম- গঞ্জের, নানা নগর-বন্দরের নানা জাতির নানা বর্ণের নানা পেশার নানা ভাষা-ভাষীর নানা সংস্কৃতির রঙ্গে রঞ্জিত নানা সমস্যায় সমস্যা গ্রস্ত মানুষের সমস্যার সমাধানে নানাধরণের উপদেশ দিয়েছিলেন। স্বভাবতই বুদ্ধবাণীর প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু ছিল নানা আকারের ও নানা ধরণের। নানা দৃষ্টিতে বুদ্ধবাণী বিবিধ প্রকারের হলেও মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল তিন প্রকারের- (১) বিনয়, (২) সুত্ত, ও (৩) অভিধম্ম।

বিনয়ঃ- তথাগত বুদ্ধ তাঁর গৃহত্যাগী শিষ্য-শিষ্যা (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী) গণের ব্যক্তিগত ও সংঘগত সামূহিক জীবনযাপন-শৈলীকে সার্থক ও সুব্যবস্থিত আর অধিকতর লোক-হিতকর করে তোলার উদ্দেশ্যে যেসব বিশেষ ('বি') নিয়মাবলীর (নয়) বিধান (অনুশাসন বা আজ্ঞা প্রজ্ঞপ্ত করেছিলেন) দিয়েছিলেন তাদের সংগ্রহকে 'বিনয়' বলা হয়।

সুত্তঃ- সাধারণ ও বহুসংখ্যক শ্রোতাদের হিতার্থে শাস্তা যে সব উপদেশ সুন্দর (সু) ভাবে (অর্থাৎ বিস্তৃতাকারে ও বোধগম্য শৈলী ও শব্দে) দিয়েছিলেন (উক্ত) তাকে 'সুত্ত' (সুক্ত) সংজ্ঞা দেয়া হয়।

অভিধম্মঃ- বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও প্রবুদ্ধ শিষ্য-শিষ্যাসমূহের হিতে চুলচেরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মবিশ্লেষক ও পরমার্থ বিষয়ক সার-সংক্ষিপ্ত যে বিশেষ (অভি) শৈলীর উপদেশ (ধর্ম) শাস্তা কর্তৃক দেশিত হয়েছিল তার সংগ্রহকে 'অভিধর্ম' বলা হয়।

তিপিটকঃ- এভাবে বিভাজিত বুদ্ধবাণীর তিন খণ্ড (পিটক)-কে একত্রে ত্রিপিটকও বলা হয়। ত্রিপিটকের যে খণ্ডে 'বিনয়' সংগ্রহীত রয়েছে তা 'বিনয়-পিটক', যে খণ্ডে 'সুত্ত' সংগ্রহীত রয়েছে তা 'সুত্ত-পিটক', আর

যে খণ্ডে 'অভিধর্ম' সংগ্রহিত রয়েছে তা 'অভিধর্ম-পিটক' রূপে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হয়েছে। এ তিন পিটকের প্রত্যেকটিই বিশাল আকারের। এ কারণে এরা নানা খণ্ডে বিভক্ত।

তিপিটক		
বিনয়-পিটক	সুত্ত-পিটক	অভিধম্ম-পিটক

বিনয়-পিটকঃ- ত্রিপিটকের বিনয়-পিটকটি আবার নিম্নলিখিত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত (১) বিভংগ, (২) খন্ধক ও (৩) পরিবার।

বিনয়-পিটক				
বিভংগ		খন্ধক		পরিবার
ভিক্খু-বিভংগ	ভিক্খুণী-বিভংগ	মহাবগ্গ	চুল্লবগ্গ	

সুত্ত-পিটকঃ- এ পিটকও বিনয়পিটকের ন্যায় নানা খণ্ডে বিভক্ত, মুখ্যত পাঁচটি খণ্ডে। এদের এক একটি খণ্ডকে 'নিকায়' সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। 'নিকায়' এর অর্থ হল- একই ধরণের ও একই আকারের সূত্রসমূহের গুচ্ছ। উপরোক্ত পাঁচটি খণ্ড বা নিকায় হল - (১) দীঘনিকায়, (২) মজ্ঝিমনিকায়, (৩) সংযুত্তনিকায় (৪) অংগুত্তরনিকায়, আর (৫) খুদ্দকনিকায়।

সুত্ত-পিটক				
দীঘনিকায়	মজ্ঝিমনিকায়	সংযুত্তনিকায়	অংগুত্তরনিকায়	খুদ্দকনিকায়

দীর্ঘনিকায়ঃ- এতে দীর্ঘ আকারের ৩৪ টি সূত্র সংগ্রহ রয়েছে।

মধ্যমনিকায়ঃ- এ নিকায়ে রয়েছে গদ্য শৈলীতে রচিত মধ্যম আকারের ১৫২ টি সূত্রের সংগ্রহ।

সংযুক্তনিকায়ঃ- গদ্য, পদ্য বা গদ্য-পদ্য শৈলীতে রচিত ছোট বড় আকারের ৭,৭৬২ টি সূত্রের মিশ্রণ। এ কারণে এ সংগ্রহকে সংযুক্ত-নিকায় বলা হয়।

অংগুত্তরনিকায়ঃ- শাস্তা দেশিত ৯,৫৫৭ টি সুত্তের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর ক্রমোত্তর সংখ্যার ভিত্তিতে নানা নিপাতে বিভাজিত ও সজ্জিত হওয়ায় এ নিকায়কে অংগুত্তরনিকায় বলা হয়।

খুদ্দকনিকায়ঃ- এ নিকায়টি সূত্রপিটকের পঞ্চম ও অন্তিম-নিকায়। নামে ক্ষুদ্রকনিকায় হলেও, বস্তুত এটি মোটেই ক্ষুদ্রক আকারের নয়। আকারের দৃষ্টিতে উপরোক্ত পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে এ নিকায়টিই সর্বাপেক্ষা বিশাল। তা হলে এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে 'সুত্তপিটকে'র শেষ চার নিকায় অপেক্ষা এ নিকায় বড় হওয়া সত্ত্বেও এ নিকায়ের নাম 'খুদ্দকনিকায়' কেন রাখা হল? এ নামের সার্থকতা রইল কোথায় তা হলে? এ প্রশ্ন যে আজকের পাঠকের মনেই প্রথম উঠেছে, তা নয়। অতীতের পাঠক-বর্গের মনেও এধরণের প্রশ্ন জেগেছিল।

এর সার্থকতা দর্শানোর উদ্দেশ্যে অর্থকথাকার আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর অর্থকথায় স্পষ্ট করে বলেছেন- 'খুদ্দকনিকায়' শব্দটি কোন এক গ্রন্থ বিশেষের নাম নয়। এটি ১৫ টি স্বতন্ত্র গ্রন্থের এক সামূহিক নাম বিশেষ। 'খুদ্দক (ক্ষুদ্রক) পাঠ' গ্রন্থটি ক্ষুদ্রক-নিকায়ের অন্তর্গত পনেরটি গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে ছোট (ক্ষুদ্রক)। আকারে ছোট হলেও, এর অন্তর্গত পাঠ্য পাঠ বিশেষের ধর্মীয় গুরুত্ব কোন অংশে কম ভাবা

যেতে পারে না। এর প্রতি জিজ্ঞাসু-জনের সুদৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নামকরণের প্রচলিত পরম্পরা হতে একটু সরে গিয়ে এ গ্রন্থের নাম 'খুদ্দকনিকায়' রাখা হয়েছে।

বিনয়পিটক, সুত্তপিটকের চার নিকায়ে (দীঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, সংযুত্তনিকায় আর অংগুত্তরনিকায়) এবং অভিধম্মপিটকে যে সব বুদ্ধবাণী সংগ্রহিত হয় নি ওসবকে এখানে (অর্থাৎ ক্ষুদ্রকনিকায়ে) সংগ্রহীত করা হয়েছে। বস্তুত ক্ষুদ্রক-নিকায়ে 'ক্ষুদ্রক' (খুদ্দক) শব্দটি 'অন্যান্য' অবশিষ্ট শেষ সব অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

ক্ষুদ্রকনিকায়ঃ- পূর্বেই বলা হয়েছে এ নিকায়টি কোন এক গ্রন্থ বিশেষের নাম নয়। এটি ১৫ টি স্বতন্ত্র গ্রন্থের সামূহিক নাম বিশেষ। এর অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর নাম এরূপ- **(১) খুদ্দকপাঠ, (২) ধম্মপদ, (৩) উদান, (৪) ইতিবুত্তক, (৫) সুত্তনিপাত, (৬) বিমানবত্থু, (৭) পেতবত্থু, (৮) থেরগাথা, (৯) থেরীগাথা, (১০) জাতক, (১১) নিদ্দেস, (১২) পটিসম্ভিদামগ্গ, (১৩) অপদান, (১৪) বুদ্ধবংস, (১৫) চরিয়াপিটক।**

খুদ্দকপাঠের স্থানঃ- ক্ষুদ্রকনিকায়ের অন্তর্গত পনেরটি গ্রন্থের মধ্যে 'ক্ষুদ্রকপাঠ গ্রন্থটি সবচেয়ে ছোট। কিন্তু তা ছোট হওয়া সত্ত্বেও প্রথম স্থান অধিকার করে। এ গ্রন্থের নামের আধারেই এ নিকায়ের নামকরণ হয় 'ক্ষুদ্রকনিকায়'।

'ক্ষুদ্রকপাঠ'-এর পাঠ্য বিষয়বস্তু

এ গ্রন্থে সব মিলে নয়টি পাঠ রয়েছে। পাঠগুলো হল --
(১) সরণত্তয় (শরণত্রয়), **(২) দসসিক্খাপদ** (দশশিক্ষাপদ), **(৩) দ্বত্তিংসাকার** (বত্রিশ প্রকারের অশুভ তত্ত্ব), (৪) **কুমারপঞ্হ** (কুমার প্রশ্ন), **(৫) মঙ্গল-সুত্ত** (মঙ্গল সূত্র), **(৬) রতন-সুত্ত** (রত্ন

সূত্র), **(৭) তিরোকুড্ড-সুত্ত** (দেয়ালের পারে প্রতীক্ষমান প্রেতগণের উদ্দেশ্যে উপদিষ্ট সূত্র), **(৮) নিধিকণ্ড-সুত্ত** (নিধিসমূহ সম্পর্কে সূত্র) আর **(৯) মেত্ত-সুত্ত** (মৈত্রী সূত্র)।

এ পাঠ-সমূহের মধ্যে শেষের পাঁচটি পাঠ আকারে বড় ও ত্রিপিটকে 'সূত্র' রূপে অতি চর্চিত। প্রথম চারটি 'পাঠ' শেষের সূত্র পাঁচটি হতে আকারে অনেক ছোট। আবার এই ছোট পাঠগুলোর মধ্যে এ গ্রন্থের প্রথম অর্থাৎ সরণত্তয় (শরণত্রয়) পাঠটি সবচেয়ে ছোট। এটি দিয়ে ক্ষুদ্রকপাঠ গ্রন্থটির শুভারম্ভ হয়।

মূল গ্রন্থকারঃ- উপরোক্ত বিষয়সূচী হতে একটি কথা স্বতই স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে পাঠগুলোর মূল স্রোত বিনয়-পিটক ও সূত্র-পিটকে রয়েছে। নানা সূত্র হতে অংশত বা পূর্ণত ঐগুলো সংগ্রহিত গ্রন্থের সব কটি পাঠ্য বিষয়ই শাস্তা কর্তৃক দেশিত হয়েছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এ গ্রন্থের মূল গ্রন্থকার শাস্তা স্বয়ং। তবে শাস্তা নিজ হাতে কিছুই লিপিবদ্ধ করে যান নি। প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে উপস্থিত আনন্দ, উপালি, মহাকাশ্যপ প্রমুখ সংগীতি-কারক-ভিক্ষু-সংঘ এ গ্রন্থ-সংকলকের ভূমিকা পালন করেন।

গ্রন্থ-সংকলনের উদ্দেশ্যঃ- শিশু-সুলভ মন ও মস্তিষ্ক সম্পন্ন কচি-কাঁচা শিক্ষার্থী ও জিজ্ঞাসুজনের এবং বিশেষত সংঘে প্রবেশপ্রার্থী শিশিক্ষুগণের এবং উপসম্পদাপ্রার্থী শ্রামণেরগণকে সংঘপিতা শাস্তা-দেশিত ধর্ম-বিনয়ের সামান্য ও প্রাথমিক পরিচয়দানের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থের সংকলন হয়েছে।

শ্রীলংকা, ম্যানমার, থাইল্যাণ্ড, লাওস, কম্বোডিয়াদি বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ দেশের স্থবিরবাদী বিহারসমূহে সংঘে প্রবেশেচ্ছুক উপাসক-উপাসিকাগণ ও উপসম্পদাপ্রার্থী শ্রামণেরগণের মানসিক যোগ্যতা পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থবির-মহাস্থবিরগণ এ গ্রন্থটি তাদের হাতে তুলে

দেন। শিক্ষার্থীগণ গুরুর নির্দেশে একে একে সব কটি পাঠ তাল, লয় ও শুদ্ধ উচ্চারণের সাথে আবৃত্তি ও কণ্ঠস্থ করার অভ্যাস করে। পরবর্তী পর্যায়ে এসবের অর্থোদ্ধার করেন। ভাবার্থ বিশ্লেষণ করতে শেখেন। এর পর অন্য ধর্মগ্রন্থ তাঁদের অধ্যয়ন করতে দেয়া হয়।

গ্রন্থের জনপ্রিয়তা :- সুবোধ্য পালি ভাষায় তথাগত বুদ্ধ দেশিত ধর্ম ও দর্শনের সারকথা এতে নিহিত থাকায় এ ক্ষুদে আকারের গ্রন্থটি ছোটদের সাথে বড়দের মধ্যেও জনপ্রিয় হয়। ভারতবর্ষের হিন্দীবহুল এলাকায় এর বেশ কয়েকটি সংস্করণ দেবনাগরী লিপিতে ও হিন্দী অনুবাদ সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও অরুণাচল, আসাম, গৌহাটি, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মহারাষ্ট্র অন্ধ্রপ্রদেশাদিতে স্থানীয় লিপি ও ভাষায় এ গ্রন্থের কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। শুধু ভারতেই নয় বিশ্বের বৌদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের স্থানীয় লিপিতে লিপ্যান্তরিত ও স্থানীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এ হতেই এ গ্রন্থের জনপ্রিয়তার আঁচ করা যায়। মোটকথা জনপ্রিয়তা অর্জনের দৃষ্টিতে 'ধর্মপদে'র পরেই 'ক্ষুদ্রকপাঠ' এর স্থান।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে এবং পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সাহিত্য-ভাণ্ডারেও ক্ষুদ্রকপাঠের মুদ্রিত প্রতিলিপি দেখা যায়। এখানেই প্রথম এ গ্রন্থটি বঙ্গাক্ষরে ও বাংলাভাষায় অনুবাদ সহকারে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এ কাজে এ দু'দেশের বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজের দিশারী পণ্ডিত স্থবির-মহাস্থবিরগণের অবদান অবশ্যই স্মরণীয়।

বর্তমান এপার ওপার বাংলায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভিক্ষু-স্থবির-মহাস্থবিরগণের ও উপাসক-উপাসিকার সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়লেও সদ্ধর্মের প্রচার-প্রসারমূলক কাজে, বিশেষত সাহিত্য সৃজনের গ্রন্থ প্রকাশনার কাজে তাদের তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে

রয়েছি। এপার ওপার বাংলার বাঙ্গালী বৌদ্ধ পরিবার আর বিহার সমূহে এ গ্রন্থের পঠন-পাঠনের পরম্পরা আজ আর নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। এর পঠন-পাঠনের ব্যাপারটা তো অনেক দুরের কথা; আজ ঐ সব বিহারসমূহের কোনটিতে পিটক সাহিত্যের সবচেয়ে ছোট আকারের এ ক্ষুদ্রক-পাঠ গ্রন্থের বাংলা অক্ষর লিপিতে লিপ্যান্তরিত ও বাংলা ভাষায় অনুদিত সংস্করণের প্রতিলিপির দর্শনলাভও দুর্লভ হয়ে পড়েছে। এ ঘটনাই আমার উপরোক্ত মন্তব্যের প্রমাণ।

সাথে সত্যান্বেষী ও জিজ্ঞাসুজনের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অথচ তাদের জিজ্ঞাসা নিরসনের আর সমস্যার আশু সমাধানের তেমন কোন উল্লেখনীয় ও উৎসাহবর্ধক প্রয়াস এ সমাজে দৃষ্ট হয় না। এ কারণে যুবক-যুবতীদের অধিকাংশই বিপথগামী হতে বাধ্য হয়।

জাতি-ধর্ম-সমাজের ভাবী ধারক-বাহক যুবাবর্গকে সুপথগামী করে তোলার মানসে 'ক্ষুদ্রকপাঠ' গ্রন্থটির অনুবাদ-করণের কাজে ব্রতী হই। গ্রন্থপ্রকাশনার কাজে কোন উৎসাহী উদারমনা ব্যক্তি এগিয়ে এলে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস অদূর ভবিষ্যৎতে সফল হবে ভেবে আশ্বস্ত হতাম। কেহ না কেহ কোন না কোন সমাজদরদী ব্যক্তি অবশ্যই এগিয়ে আসবেন আশায় আশান্বিত ও প্রতীক্ষারত রইলাম।

।। ভবতু সব্বমঙ্গলং।।

তারিখ : ১৯/০৫/২০০৮ অনুবাদক
তিথি : বুদ্ধ পূর্ণিমা ভিক্ষু সত্যপাল

ক্ষুদ্রক-পাঠ মাহাত্ম্য

বুদ্ধ তাঁর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর হতে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির পুর্বক্ষণ অবধি বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় বর্ষার বারিধারার ন্যায় অগণিত অমূল্য উপদেশ বর্ষণ করেন। ঐ সব উপদেশকে সংক্ষেপে 'বুদ্ধ (বাণী)-বচন' বা 'ধর্ম' বলা হয়।

বুদ্ধের 'ধর্মের মূলরূপ' 'পিটক' নামক শাস্ত্রে সুরক্ষিত রয়েছে। 'পিটকে' সংগৃহীত 'বুদ্ধবাণী' বা 'ধর্ম'-এর বিষয়ভেদে মুখ্য তিনটি বিভাজন রয়েছে। এদের নাম **(১) বিনয়-পিটক, (২) সুত্ত-পিটক ও (৩) অভিধম্ম-পিটক**। এ কারণে পিটককে **'তিপিটক'**ও (ত্রিপিটক) বলা হয়। এ 'পিটক' সাহিত্য (মূলত) পালি ভাষায় রচিত হওয়ায় একে 'পালি পিটক' বা **'পালি তিপিটক'** সাহিত্যও বলা হয়।

'পালি পিটক' সাহিত্যের মুখ্য তিন বিভাজনে 'সুত্তপিটক' দ্বিতীয় 'পিটক'-রূপে সুবিদিত। এ সুত্তপিটকের বিষয়বস্তু পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত। এর এক একটি বিভাগ 'নিকায়' রূপে বিশেষিত হয়। এ সব নিকায়ের নামকরণ এতে সংগৃহীত সূত্র **(সুত্ত)** সমূহের আকার ও শ্রেণীভেদে করা হয়েছে।

যেমন-- **(১) দীঘনিকায়, (২) মজ্ঝিমনিকায়, (৩) সংযুত্তনিকায়, (৪) অঙ্গুত্তরনিকায় ও (৫) খুদ্দকনিকায়।**

খুদ্দকনিকায়:- এ পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে **খুদ্দকনিকায়,** 'সুত্তপিটকের' পঞ্চম ও শেষ নিকায়। এ নামটি কোন এক বিশেষ গ্রন্থের নাম নয়। এটি পনেরটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের সামূহিক নাম। উপরোক্ত তালিকায় প্রদত্ত পনেরটি গ্রন্থকে **'খুদ্দকনিকায়'** শীর্ষকের অন্তর্ভুক্ত করার পরম্পরার

প্রারম্ভ তথাগত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর মগধের রাজধানী রাজগৃহে আয়োজিত প্রথম বৌদ্ধ সংগীতিতে নিযুক্ত সংগীতিকারক পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাধ্যমে হয়।

'খুদ্দক-নিকায়ে'র সংস্কৃত বা বাংলা সমার্থক শব্দ হল 'ক্ষুদ্রক-নিকায়'। নামে যদিও মনে হয় এ নিকায়টি অপর চার 'নিকায়' হতে ক্ষুদ্রক আকারের, আসলে কিন্তু এটি অপর সব নিকায় অপেক্ষা বড়।

যদি তা হয়ে থাকে, তবে এর এ নাম কেন দেওয়া হল? এ নামের সার্থকতা কোথায়?

এহেন অর্থকথাকার আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে এ নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত পনেরটি গ্রন্থের প্রথমটি অর্থাৎ ক্ষুদ্রকপাঠ **(খুদ্দকপাঠ)-** এর নামানুসারে এ নিকায়ের নামকরণ করা হয়েছে।

এ নিকায়ের কিছু গ্রন্থের অংশবিশেষ গদ্য-পদ্যের মিশ্রণ- শৈলীতে রচিত। কিছু শুদ্ধ গদ্যাকারে রচিত। আর অবশিষ্ট গ্রন্থের অধিকাংশ বিষয়বস্তু শুদ্ধ 'গাথা' (পদ্য) আকারে নিবদ্ধ। 'পিটক' সাহিত্যের গাথাবদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য এতেই নিহিত রয়েছে।

খুদ্দকপাঠ

খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রথম গ্রন্থের নাম **'খুদ্দকপাঠ'**। এটি ছোট আকারের পঠনীয় উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থের নাম।

বিষয়বস্তু

এর অন্তর্ভুক্ত ন'টি পাঠ বা উপদেশের নাম এরূপ--

(১) সরণত্তয় (শরণ-ত্রয়)

(২) দসসিক্খাপদ (দশশিক্ষাপদ)

(৩) দ্বত্তিংসাকার (বত্রিশ আকার)

(৪) কুমারপঞ্হা (কুমারকে কৃত প্রশ্ন)

(৫) মঙ্গল-সুত্ত (মাঙ্গলিক লক্ষণ বিষয়ক উপদেশ)

(৬) রতন-সুত্ত (রত্ন বিষয়ক উপদেশ)

(৭) তিরোকুড্ড-সুত্ত (দেয়ালের পারে প্রতিক্ষারত প্রেতদের প্রতি কর্তব্য-বিষয়ক উপদেশ)

(৮) নিধিকণ্ড-সুত্ত (প্রকৃত ধন সঞ্চয় বিষয়ক উপদেশ)

(৯) মেত্ত-সুত্ত (মৈত্রী সম্প্রসারণের সুপরিণাম বিষয়ক উপদেশ)

এদের মধ্যে প্রথম চারটি ব্যতীত শেষ পাঁচটি বুদ্ধোপদেশ অপেক্ষাকৃত বড় আকারের। এবার উপরোক্ত পাঠসমূহের প্রতিটির বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব একটু বিষদাকারে বর্ণিত হবে।

১। সরণত্তয়

এ শব্দটি এখানে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় পাঠের নাম হিসেবে এসেছে। এ পালি শব্দের সমার্থক বাংলা শব্দ (হল) 'শরণ-ত্রয়'।

'শরণ-ত্রয়' শব্দটি মূলত একটি বিশেষ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ। বৌদ্ধ ধর্ম এবং মানব-সভ্যতার বিকাশে 'শরণ-ত্রয়ের ভূমিকারূপে মানব মনে' শরণ-গ্রহণের প্রবৃত্তির প্রাক্কথা এখানে উত্থাপিত হল।

মানব-সভ্যতা বা ধর্ম-সাহিত্যাদির অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে বিপন্ন বা আসন্ন বিপদগ্রস্থ মানুষও অন্য সামান্য প্রাকৃতিক প্রাণীর ন্যায় বিপন্মুক্তির উদ্দেশ্যে লতা-গুল্ম, বৃক্ষারণ্য, গুহা ও স্মারক (পূজা)-স্থল ইত্যাদি প্রাকৃতিক শরণ-স্থলে শরণ গ্রহণ করতো। এসব শরণস্থলে শরণাপন্ন মানুষ আবহাওয়া বা জলবায়ুর পরিবর্তন ও আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাজাত আপদ-বিপদ হতে সাময়িক রক্ষা পেলেও পূর্ণত ভয় ও সমস্যামুক্ত হতে পারে নি। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু জনিত ভয় তো লেগেই ছিল।

কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শরণস্থলে আশ্বস্থ হতে না পেরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মানবের সব সমস্যার পেছনে পরোক্ষে এক বা একাধিক অদৃশ্য দৈবী শক্তির হাত রয়েছে ধারণায় দেবতুষ্টি-সাধনের পত্র, পুষ্প, জল, ফলাদি অর্পণ, তর্পণ ও সমর্পণের বিবিধ প্রথার প্রচলন হয়। এসবের মাধ্যমে পূর্ণত আশ্বস্থ হতে না পেরে মানুষ কিছু বিশেষ স্তুতি-বাক্যের রচনা ও আবৃত্তির (শব্দ-শক্তির প্রয়োগে) মাধ্যমে দেব-দেবীগণের অধিক তুষ্টি সাধনের উপায় অবলম্বন করে। খুব সম্ভবত এ কারণেই ক্রমশ মানব-সমাজে প্রাচীন ধর্ম-সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়। এভাবে সমাজে বহু-দেব-বাদের সৃষ্টি হয়। মানুষের চিন্তন প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের সাথে সাথে মানস-জগতের সীমাও সম্বর্দ্ধিত হয়। এসব

অসংখ্য দেব-দেবীর শরণ নিয়েও মানুষ নিজেকে পূর্ণত ভয় ও সমস্যা মুক্ত না দেখে এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতাশালী কোন এক দেব বা দেবীর অন্বেষণে রত হয়। এই প্রক্রিয়ার কোন এক পর্যায়ে ঈশ্বরবাদের সৃষ্টি হয়। ঈশ্বরবাদে ঈশ্বরকে প্রাণী জগৎ সহ দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হবার মান্যতা দেওয়া হয়। এই ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে প্রাণীর আভ্যন্তরীন বা বাহ্য জগতে কোথাও কিছুই ঘটে না। বাস্তবে তা হয় কিনা কে তার প্রমাণ দেবে? ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ঈশ্বরবাদের যথার্থতা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে চিন্তাশীল মানবের কাছে এক ক্রমবর্দ্ধমান সন্দেহাস্পদ প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তবে এই ঈশ্বর যাই হউক না কেন মানুষ যে এই ঈশ্বর-শব্দ, ঈশ্বর-অবধারণা ও ঈশ্বরবাদের স্রষ্টা এতে কোন চিন্তাশীল মানুষের দ্বিমত নেই। ধর্ম, দর্শন ও প্রাচীন সাহিত্য অভ্যুদয়ের এ দিকটির সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণান্তে ঈশ্বরকে কল্পনা-বিলাসী মানুষের এক মানসপুত্র এবং মানুষের কল্পনা-শক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা হলে কি ভুল হবে?

মানুষের পূর্ণ ভয় বা সমস্যা মুক্তির স্থায়ী ও সুনিশ্চিত উপায় অন্বেষণের নানা প্রয়াসের পরিণামে অর্পণ, তর্পণ ও সমর্পণাদির সরল ও প্রাকৃতিক মুলরূপ হারিয়ে ফেলে, আর যাগ-যজ্ঞের জটিল হতে জটিলতর বিবিধ প্রথার প্রচলন হতে থাকে। সেই সাথে মত-মতান্তরের ও ধর্ম-সাহিত্যের আকার ও সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। আরাধ্য দেব-দেবী বা ঈশ্বরের সম্মুখে মানুষের শরণাপন্ন হবার কারণ অনেক থাকলেও কারণ মুখ্যত চারটি। মানুষকে সাধারণত (১) আরাধ্য দেবদেবী বা ঈশ্বরের কোপ-ভাজন না হবার মানসে, আর না হয় (২) শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক আপদ-বিপদ হতে রক্ষা পাবার মানসে; আর না হয়, (৩) শত্রুর ক্ষতি-সাধনের মানসে; আর না হয় (৪) বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-সম্পত্তি, আরোগ্য-

সম্পত্তি, পরিবার-সম্পত্তি, ঋদ্ধি-সিদ্ধি আদির বৃদ্ধির মানসে এসবের শরণার্থী হতে দেখা যায়। এসবের শরণার্থী হয়েও কি মানুষ তার মূলভূত ভয় ও সমস্যার পূর্ণ লাঘব করতে পেরেছে? যা হোক এসব দেববাদ বা ঈশ্বরবাদকে ভিত্তি করে কিছু মানুষকে আরাধ্য দেবদেবী বা ঈশ্বরের তুষ্টি সাধনের মাধ্যমে তাদের অধিক কৃপাপাত্র হবার মানসে এবং অতীতের অজানা দুঃখভার সহসা লাঘবের উদ্দেশ্যে নিরন্তর দুঃখ-বর্দ্ধক কৃত্রিম উপায়ের শরণ নিতেও দেখা যায়।

অপর শ্রেণীর কিছু মানুষ জীবনের সব ঘটনাকে ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নিয়ে নীরবে অসহায় ব্যক্তির ন্যায় সব সয়ে যায় ও অপরকেও সয়ে যাবার পরামর্শ দেয়।

আর কিছু চিন্তাশীল মানুষ দেববাদ, ঈশ্বরবাদ বা নিয়তি-বাদকে কোন প্রকারের গুরুত্ব না দিয়ে জীব ও জগতের উৎপত্তি এবং এতে ঘটমান সব ঘটনাকে এক আকস্মিক ঘটনারূপে ব্যাখ্যা করেন। সব কিছুই আকস্মিক হওয়ায় তাদের সম্মুখে অসহায় মূকপ্রাণীর ন্যায় সব সয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই।

ভৌতিকবাদী ব্যাখ্যায় চার বা পাঁচ মহাভূতের সংমিশ্রণে সৃষ্ট এ জীবনে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সুখই সার। জীবনে লব্ধ দুঃখানুভূতিকে উপেক্ষা করে যেন তেন প্রকারেন সুখ প্রাপ্ত করা প্রাণীর মুখ্য কর্তব্য। এসব মতবাদ বহুকাল যাবৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে বুদ্ধকালীন ভারতীয় সমাজে চলে আসছিল, আর আজও বিদ্যমান রয়েছে।

বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ তাঁর বাল্যাবস্থা হতেই এ সব মতবাদ সম্পর্কে অবহিত হয়ে পড়েছিলেন। যৌবনে তিনি বৈবাহিক ও সাংসারিক কর্মে সুখ-সেবনের দুষ্পরিণাম জেনে মহাভিনিষ্ক্রমণ করেন। এর পর সম-সাময়িক আরও কিছু প্রখ্যাত ধর্মাচার্যগণের সান্নিধ্যে ধ্যানাভ্যাস

প্রশিক্ষণের পরও জিজ্ঞাসা শান্ত না হওয়ায় বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ প্রায় ছয় বছর কৃচ্ছ-সাধনের প্রাণান্তক চরম পন্থারও শরণ গ্রহণ করেছিলেন। শেষে নিরর্থক জেনে এ পন্থাকেও বর্জন করেন। দুই অতি বর্জিত এক অভিনব তৃতীয় পথ আবিষ্কার করেন। এতে বোধি-পূরক আটটি আধ্যাত্মিক অঙ্গ রয়েছে। এদের নাম হল- সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি। একারণে একে তিনি অষ্টাঙ্গিক (মধ্যম) মার্গ নাম দিয়েছেন। উপরোক্ত দুই অতি বর্জিত হওয়ায় তিনি একে মধ্যম মার্গ বলে থাকেন। এমার্গ অবলম্বন করে তিনি বুদ্ধ হন। তাঁর সব জিজ্ঞাসার সমাধান এতে হয়। এ মার্গেই তাঁর পরম সুখ প্রাপ্তি হয়। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁকে স্বয়ম্ভু বলা হলেও অত্যুক্তি হবে না। তাঁর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিতে কোন দৈবী বা ঐশ্বরিক শক্তির হাত ছিল কি, ছিল না এ ব্যাপারে ঈশ্বরবাদী বা দেববাদীদের নীরব জিজ্ঞাসা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলা যায় বুদ্ধ কখনই এক দেববাদী বা একেশ্বরবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বহু-দেব-দেবীবাদী। তবে তাঁর বহু দেব-বাদে ঐ সব দেবদেবীর কেহই শাশ্বত বা নিত্য নন। অন্য প্রাণীর ন্যায় কর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় তারাও জাতি, জরা, ব্যাধি, মরণশীল। সাথে একথাও বলতে দ্বিধা নেই যে তাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন সমস্যায় গ্রস্ত।

অন্য যোনিতে জাত প্রাণীর মানসিক শক্তি ও উর্বরতা অনেক ক্ষেত্রে মানব অপেক্ষা হীনমানের। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তো বটেই। এ ব্যাপারে মানবযোনি কেবল উত্তম আধার নয়, মানব-যোনিতে জন্ম না নিয়ে কোন প্রাণীর পক্ষে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি কদাপি সম্ভব নয়। এ কারণে আত্মবলে বলীয়ান মানবপুত্ররূপে জাত বোধিসত্ত্ব কোন দেবদেবীর বা ঈশ্বরের বা ব্রহ্মার শরণ না নিয়েই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর

উরুবেলা (বুদ্ধগয়া) হতে বারাণসী যাবার পথে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বুদ্ধকে এক আজীবক উপক প্রশ্ন করেন- কার উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যিত হয়েছেন? কেই বা আপনার গুরু? আর কার ধর্মে আপনার রুচি?

প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ জানান দেব-মানব-ব্রহ্মাগণের বাসস্থান এই ব্রহ্মাণ্ডে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রাণীর অস্তিত্বের কথা তো দুরে থাকুক, আমার সমতুল্য প্রাণীও দেখছি না। এখানে আমার শিক্ষক হবার যোগ্যতা কার রয়েছে? আমি সর্বজ্ঞ। আমি সর্বজয়ী। আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ। আমি অনুত্তর শিক্ষক। আমিই জিন। আমার সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তি আমার নিজ ত্যাগ-তিতিক্ষা, অধ্যাবসায় ও অভিজ্ঞান বলে হয়েছে। এক অশ্রুত-পূর্ব ধর্মচক্র প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বারাণসী যাচ্ছি।

পঁয়তাল্লিশ বছরের ধর্মরাজ্য-শাসনকালে বুদ্ধ কাউকে তাঁর শরণাপন্ন হতে বাধ্য করেছেন এমন একটি নজিরও পালি পিটক সাহিত্যে নেই। তবে বিপথগামীকে ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তিনি কখন কখন নানা কৌশলের প্রয়োগ করেছেন, এমন নজির এক, দুই নয়, অজস্র রয়েছে। তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাবে উপকৃত হয়ে কেহ (যদি) স্বেচ্ছায় তাঁর শরণাপন্ন হতে চাইলে তিনি করুণাবশত শরণার্থীকে কোনদিনই বিমুখ বা হতাশান্বিত করতেন না। উদারচিত্তে তিনি শরণ দান করতেন। শরণ-গমন বা দানের ব্যাপারে বুদ্ধের নিজস্ব অভিমত ছিল। তাঁর মতে শুধু মানুষই নয়, প্রাণী মাত্রেরই জীবনের সব সমস্যার স্রষ্টা অপর কেহ নহে, সে নিজেই। অজ্ঞানতাবশত মানুষ অন্যকে নিজের দুঃখের কারণ বলে ব্যাখ্যা করে সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলে। আর মনে করে 'সমস্যার সমাধান নিজের ভেতর নেই, বাইরে কোথাও রয়েছে'। এই ভ্রান্তিতেই মানুষ নিজ সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে অপরের শরণ নিতে প্রবৃত্ত হয়। এই শরণ-গ্রহণের প্রক্রিয়া অনাদি-কাল হতে মানব-সমাজে চলে

আসছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানব-মনের আভ্যন্তরীন জগতের স্বরূপ প্রকট হবার সাথে সাথে মানবের শরণ-গ্রহণের শরণ-স্থলে প্রভূত প্রভেদ এসেছে।

বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যে শরণ-গমনের পরম্পরা প্রচলনের ও বিকাশের এক আনুক্রমিক ইতিহাস রয়েছে।

পালি পিটক সাহিত্যেও (প্রথম পিটক) বিনয়-পিটকের (প্রথম খণ্ড) মহাবর্গের বর্ণিত ঘটনাক্রম অনুসারে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তথাগত বুদ্ধ রাজায়তন-বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়া সুশীতল তলে ক্রমান্বয়ে সাত সপ্তাহ অনাহারে অবস্থান করে বিমুক্তি সুখ উপভোগ করত (পূর্বক) সপ্তম সপ্তাহ যাপন করছিলেন। সপ্তম সপ্তাহান্তে বোধিবৃক্ষের পার্শ্ববর্তী পথ দিয়ে উৎকল দেশ হয়ে দুই বণিক ভাই তপস্সু ও ভল্লুক তাদের নিজস্ব মালবাহী গাড়ীতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। অতীতে ঐ দু'ভায়ের আত্মীয়রূপে জন্ম নিয়ে এদের মাধ্যমে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন এমন এক দেবতা এদের প্রতি প্রত্যুপকার করার উদ্দেশ্যে দিব্যবাণী উচ্চারণ করে বলেন- 'সাত সপ্তাহ অনাহারে যাপন করে বুদ্ধ বর্তমানে রাজায়তন বৃক্ষের তলে বসে বিমুক্তি-সুখ উপভোগ করছেন। যাও, কিছু অন্ন দান করো। এতে তোমাদের দীর্ঘহিতকরী ও সুখবর্দ্ধক অনন্ত পূণ্য হবে।' দৈববাণীতে শোনা নির্দেশ মতে মধুপিণ্ড আদি বুদ্ধকে দান করে নিম্নোক্ত শব্দাবলী উচ্চারণের মাধ্যমে তারা উভয়ে শরণ যাচনা করেন।

'এতে ময়ং, ভন্তে, ভগবন্তং সরণং গচ্ছাম, ধম্মং চ।
উপাসকে নো, ভগবা, ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতে সরণং গতে।"
(মহাবগ্গ ১.৪. ৬ পৃঃ ৬)/ বিনয় পিটক

ভন্তে, আমরা দুজনে ভগবান ও ধর্মের শরণাপন্ন হলাম (শরণ গ্রহণ

করছি)। হে ভগবান, আজ হতে আমাদের উভয়কে আমরণ আপনার শরণাপন্ন উপাকসরূপে স্বীকার করুন।

গৌতম বুদ্ধের জীবন-ইতিহাসে এরাই এমন (দুজন) ব্যক্তি যাঁরা বুদ্ধ ও ধর্মের শরণাপন্ন হয়ে সংসারে সর্বপ্রথম উপাসকত্ব লাভে ধন্য হয়েছিলেন। পালি পিটক সাহিত্যে এদের দুজনকে 'দে-বাচিক উপাসক' রূপে পরিভাষিত করা হয়েছে।

এরপর বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদাব বনে প্রথম বর্ষাবাস যাপনের প্রারম্ভেই ধর্মচক্রের প্রবর্ত্তন করে পঞ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ তপস্বীকে নৈর্বাণিক মার্গের প্রথম সোপানে **(সোতাপত্তি-মগ্গ)** স্রোতাপত্তি-মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হবার সুপরিণাম স্বরূপ তাঁদের পাঁচ জনেরই অন্তরে এক আমুল পরিবর্তন আসে। বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের প্রতি তাঁদের অন্তরে যে সব জিজ্ঞাসা, সন্দেহ বা বিতর্ক ছিল সব কথার সঠিক সমাধান হয়ে যাওয়ায় তদ্স্থলে অচলা অটলা অসীম শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। বলবতী শ্রদ্ধার কারণে তাঁরা বলেন ---

'লভেয়্যাম ময়ং, ভন্তে, ভগবতো সন্তিকে পব্বজং লভেয়্যাম উপসম্পদং'
মহাবগ্গ/বিনয় পিটক

বাক্য-উচ্চারণের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের সান্নিধ্যে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদাপ্রার্থী হন। তাদের উপরোক্ত প্রার্থনায় বুদ্ধ বা তাঁর ধর্মে শরণ গ্রহণের উল্লেখ প্রত্যক্ষরূপে না থাকলেও, প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা দানের প্রার্থনায় পরোক্ষরূপে শরণ-গমনের যাচনা ধ্বনিত হয়। প্রার্থনানুসারে ভগবান বুদ্ধ তাদের উভয়কে **'এথ, ভিক্খবো'** বলে আহ্বান করেন। এর ঠিক পরই তাদেরকে উদ্দেশ্য করে **'স্বাক্খাতো ধম্মো, চরথ ব্রহ্মচরিয়ং সম্মা দুক্খস্স অন্তকিরিয়ায়'** বাক্য-উচ্চারণের মাধ্যমে অনুশাসন দেন। এই অনুশাসন দানের মাধ্যমে তাদের

প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ হয় অর্থাৎ বুদ্ধ-শাসনে তাঁরা পূর্ণ দীক্ষা লাভ করেন। ঐ দীক্ষাদানের মাধ্যমে বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে প্রকারান্তরে শরণ দানই দিলেন।

ঐ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আধ্যাত্মিক সুখের কিছুটা আস্বাদ পেলেও মানব ও বিশেষত ব্রহ্মচর্য-জীবনের চরম ও পরম অর্থাৎ নৈর্বানিক সুখের আস্বাদ তখনও তাঁরা পাননি। একারণে তথাগত বুদ্ধ অধিক কালক্ষেপন না করে অনাত্মধর্মী লক্ষণ পরিচায়ক উপদেশ দিয়ে তাঁদের প্রত্যেককে অরহত্ব-মার্গ-ফলে অর্থাৎ নৈর্বানিক মার্গের সর্বান্তিম সোপানে উন্নীত করান।

এর পর বুদ্ধের ঐ বর্ষাবাস যাপন কালেই বারাণসীর এক শ্রেষ্ঠী-পুত্র যশের হৃদয়ে এক রাতে কাম-সুখ-সেবনের দুষ্পরিণাম জ্ঞাত হওয়ায় প্রবল বৈরাগ্যভাব উৎপন্ন হয়। সেদিনই ব্রহ্মমূহূর্তে সে গৃহত্যাগ করে। সংযোগবশত, কোন এক অদৃশ্য আকর্ষণে শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ বুদ্ধ-সান্নিধ্যে এসে তাঁর আনুক্রমিক ধর্মোপদেশ শোনেন। স্রোতাপন্ন হন। ইতিমধ্যে পুত্রের সন্ধানে যশের পিতা শ্রেষ্ঠীও পরম সৌভাগ্যবশত ঐ স্থানেই এসে পড়েন। তবে বুদ্ধের ঋদ্ধি-শক্তির প্রভাবে পুত্র পিতাকে দেখতে পেলেও পিতা পুত্রকে দেখতে অসমর্থ হন। পুত্রহারা পিতা বুদ্ধের কাছে ঐ স্থানেই পুত্রের দেখা পাবেন এই আশ্বাসন পেয়ে কিছুটা শোকসন্তাপমুক্ত ও শ্রদ্ধান্বিত হয়ে এবং একাগ্রচিত্তে বসেন। অনুকূল মানসিক পরিস্থিতির লক্ষণ বুঝতে পেরে তথাগত বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীকে লক্ষ্য করে ধর্মোপদেশ দেন। অজ্ঞানান্ধকার বিধ্বংসক বুদ্ধের অমৃতময় ধর্মকথায় শ্রেষ্ঠীর হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। শ্রেষ্ঠী ধর্মচক্ষুর অধিকারী হন। উৎপন্নশীল সবই বিনাশশীল সংসার-সার-দর্শনের জ্ঞান হয় তাঁর। এভাবে তিনি স্রোতাপত্তি-মার্গ-ফলে প্রতিষ্ঠিত হবার পর মূহূর্তেই হাত জোড় করে বলেন---

'এসাহং, ভন্তে, ভগবন্তং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং চ ভিক্খু-সংঘং চ।
উপাসকং মং, ভগবা, ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গতং--'
মহাবগ্গ/ বিনয় পিটক

এভাবে বলে নিজেকে আজ হতে আমরণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন উপাসকরূপে স্বীকার করার প্রার্থনা করেন। আশ্চর্যের বিষয়, অন্য দিকে পিতার উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে প্রত্যক্ষীভূত ধর্মানুভূতির পর্যবেক্ষণকালে শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ অরহত্ব-মার্গ-ফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

পিতাপুত্র দুজনকেই আর্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত দেখে পিতাপুত্রের মধ্যে বিদ্যমান অদৃশ্য আবরণ সৃষ্টিকারী ঋদ্ধিশক্তি নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত করে ফিরিয়ে নেন।

পুত্রের দর্শন পেতেই পিতা তাকে বাড়ী ফিরে শোকসন্তপ্তা মাকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রাণ দান করার অনুরোধ জানান। আদেশের প্রতীক্ষায় যশ বুদ্ধের মুখের দিকে আগ্রহ সহকারে তাকিয়ে থাকলে তিনি যশের মনোভাব বুঝতে পারেন। বুদ্ধ যশের পিতাকে বুঝিয়ে বলেন- তার জ্ঞান অপেক্ষা যশের জ্ঞান অনেক উন্নত স্তরের। যশ এখন এক তৃষ্ণা-বিমুক্ত পুরুষ। তার ন্যায় ক্ষীণাস্রব ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় গৃহী-জীবনের হীন কামসেবনজনিত সুখে রত হওয়া কখনও সম্ভব নহে। প্রত্যুত্তরে পিতা জানান- যশের অরহত্ব-প্রাপ্তি কোন এক সাধারণ ঘটনা নয়। এত বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, বড়ই লাভের বিষয়। বেশ, তাহলে আপনি সশিষ্য আমার বাসভবনে আজকের অন্নগ্রহণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। মৌনভাব ধারণ করে বুদ্ধ সম্মতি দেন। সম্মতি পেয়ে প্রফুল্ল মনে শ্রেষ্ঠী নিজ বাসভবনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন। পিতা প্রস্থান করতেই যশ বুদ্ধের কাছে

প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদাপ্রার্থী হন। প্রার্থনানুসারে বুদ্ধও তৎক্ষণাৎ যশকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা ধর্মে দীক্ষা দেন।

পূর্বাহ্ন সময়ে বুদ্ধ যশকে অনুগামী শিষ্যরূপে নিয়ে শ্রেষ্ঠীর বাসভবনে যান। যশের মাতা, পিতা ও প্রাক্তন ধর্মপত্নী সকলে তাদের প্রাণভরা আদর-সৎকার করেন। যশের মা ও ধর্মপত্নী ব্যাকুল চিত্তে বুদ্ধের সামনে বসলে বুদ্ধ তাদের মনোনুকূল ধর্মোপদেশ দিয়ে তাদেরকে ধর্মচক্ষুর অধিকারিণী করে তোলেন। অতপর তারা নিম্নোক্ত বাক্যোচ্চারণের মাধ্যমে আমরণ নিজেদেরকে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাগত উপাসিকারূপে গ্রহণ করার প্রার্থনা বুদ্ধের কাছে করেন।

'এতা ময়ং, ভন্তে, ভগবন্তং সরণং গচ্ছাম, ধম্মং চ, ভিক্খু-সংঘং চ।
উপাসিকায়ো নো ভগবা ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতা সরণং গতা।'

মহাবগ্গ/ বিনয় পিটক

এভাবে শরণপ্রার্থী হলে, সকলের হিতকারী, সুখকারী ও উৎসাহবর্দ্ধক উপদেশ দিয়ে বুদ্ধ সশিষ্য প্রস্থান করেন।

এই শরণাপন্ন উপাসিকা দুই জন পিটক-সাহিত্যে সংসারের প্রথম 'ত্রি-বাচিকা উপাসিকা' (**তাব লোকে পঠমং উপাসিকা অহেসুং তেবাচিকা**) রূপে প্রশংসিত হয়েছেন।

পালি পিটকে বর্ণিত বুদ্ধের জীবনের উপরোক্ত কয়েকটি ঘটনার বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত তিনটি তথ্য উদ্ঘাটিত হয় ঃ

(১) বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের প্রারম্ভিক প্রক্রিয়ায় বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ব্যক্তি বা সমূহকে পৃথকভাবে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হতে দেখা যায় না।

(২) এই প্রক্রিয়ায় উপাসক বা উপাসিকারূপে বুদ্ধ ও ধর্মের, বা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকেই কেবলমাত্র শরণ-গমন করতে দেখা যায়।

(৩) শরণ-গমনের ইচ্ছা ব্যক্ত করার বা শরণ-দানের প্রার্থনার যে উপরিলিখিত বিধি শরণপ্রার্থীর নিজস্ব রচিত ছিল। ওসব বুদ্ধ-নির্দেশিত ছিল না।

ঐ বর্ষাবাস যাপনকালেই বারাণসীবাসী যশের চুয়ান্ন জন বন্ধুও শাস্তা বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে স্রোতাপন্ন হন। উপসম্পদা লাভের শেষে বুদ্ধোচ্চারিত অনুশাসন শুনে তাঁরা সকলে অরহত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন। এভাবে ঐ সময়ে সংসারে বুদ্ধ সহ সব মিলে একষট্টি জন অর্হৎ হন।

এ যাবৎ তিনি তাঁর শিষ্যবৃন্দের কাউকেও ধর্মপ্রচারের অধিকার দেন নি। সর্বজ্ঞ হওয়ায় তিনি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন --- ধর্মপ্রচারের অধিকার কেবল নিজের আয়ত্বাধীনে রাখা হলে, বহুজনের হিত ও বহুজনের সুখ সাধন করা এবং বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত করার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। উপরোক্ত ষাট জন অর্হৎকে সব দিক থেকে যোগ্য পেয়ে ধর্মপ্রচারের অধিকার বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নেন এর পর তিনি ঐ বর্ষাবাস শেষে তাঁদেরকে সম্বোধন করে বলেন- 'হে ভিক্ষুগণ, এ সংসারে দিব্য ও মানুষী যত প্রকারের বন্ধন রয়েছে আমি নিজে ওসব হতে পূর্ণত মুক্ত। আপনারাও ওসব হতে পূর্ণত মুক্ত। এবার বহুজনের হিতে বহুজনের সুখে দেবমানবের (সকলের) হিতে ও সুখে অর্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিয়ে বলেন- 'হে ভিক্ষুগণ, আপনারা বিচরণ করুন। একপথে দুজন যাবেন না। দিকে দিকে বিচরণ করে হে ভিক্ষুগণ, আপনারা আদি কল্যাণকারী, মধ্যে কল্যাণকারী এবং অন্তেও কল্যাণকারী স্বার্থক সব্যঞ্জন পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের

প্রকাশ করুন। (এ সংসারে আজও) অল্প রজযুক্ত চক্ষুষ্মান প্রাণী রয়েছেন। ধর্মের অশ্রবণে পরিহানি ঘটবে। শ্রবণে তারা ধর্মের জ্ঞাতা হবেন। আপনাদের ন্যায় আমিও উরুবেলার সেনানিগমে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি।'

বুদ্ধের কাছ হতে জনগণের মাঝে ধর্ম প্রচারের পূর্ণ অধিকার পেয়ে ঐ ষাটজন অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের মধ্যম দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্মচক্র-প্রবর্ত্তন-সূত্র ও তাঁদের নিজস্ব প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক অনুভূতিজাত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রচারিত অদ্ভূত ধর্মোপদেশ শুনে শ্রোতাগণের অনেকে এ আর্য ধর্মে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থী হন।

ধর্মপ্রচারের পূর্ণ অধিকার পেলেও প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থীদের প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দানের অধিকার ঐ ভিক্ষুগণের ছিল না। এ কারণে ঐ ভিক্ষুগণ বুদ্ধ কখন কোথায় রয়েছেন খোঁজ খবর নিয়ে তাদেরকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে যেতেন।

মানব জীবনের মূল সমস্যার সমাধানমূলক আড়ম্বরপূর্ণ যাগ-যজ্ঞ, তন্ত্রমন্ত্র, দর্শনাদির জটিলতা, দৈত্য-দানব, দেব-দেবী ও ঈশ্বরাদির ভয় বর্জিত সাম্য ও সমতাবাদী এই নতুন ধর্ম, জনগণের সরল ভাষায় প্রচারিত হওয়ায় সমাজের সর্ব শ্রেণীর মানুষের সুদৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। জীবনকে সরল ও সমস্যা মুক্ত করার এক নতুন আশার আলোকে উদ্ভাসিত ও আশান্বিত হয়ে অনেকে দলে দলে এভাবে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করে সংঘশক্তি সুদৃঢ় করেন। বুদ্ধ সান্নিধ্যে এসে ঐ ভিক্ষুগণও শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় সমুন্নত হয়ে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েন।

দেশ-দেশান্তর হতে বুদ্ধের কাছে আসতে ভিক্ষু ও প্রব্রজ্যা প্রার্থী উভয় পক্ষকেই শারীরিক কষ্ট ভোগ করা ছাড়াও আরও নানান অসুবিধার

সম্মুখীন হতে হতো। তদুপরি এতে ধর্ম-প্রচারের গতিও অনেক ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ হতো।

এসব অসুবিধার কথা ভেবে বারাণসী হতে উরুবেলা যাবার পথে কোন এক স্থানে সমবেত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বুদ্ধ বলেন---

অনুজানামি, ভিক্খবে, তুম্হে' ব দানি তাসু তাসু দিসাসু তেসু তেসু জনপদেসু পব্বাজেথ উপসম্পাদেথা' তি। এবং চ পন ভিক্খবে, পব্বাজেতব্বো উপসম্পাদেতব্বো।

পঠমং কেসমসসুং ওহারাপেত্বা কসায়ানি বত্থানি আচ্ছাদাপেত্বা একংসং উত্তরাসঙ্গং কারাপেত্বা, ভিক্খুনং পাদে বন্দাপেত্বা উক্কুটিকং নিসীদাপেত্বা অঞ্জলী পগ্গণ্হাপেত্বা এবং বদেহী'তি বত্তব্বো---

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।।

দুতিয়ং পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
দুতিয়ং পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
দুতিয়ং পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।।

ততিয়ং পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ততিয়ং পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
ততিয়ং পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।।

'অনুজানামি, ভিক্খবে, ইমেহি তীহি সরণগমনেহি পব্বজং উপসম্পদং।'
মহাবগ্গ/ বিনয়পিটক

উপরোক্ত অনুজ্ঞার মাধ্যমে তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বিচরণকালে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা

প্রার্থীকে তাঁর কাছে না এনে প্রার্থনাস্থলেই তৎক্ষণাৎ এক সুনির্ধারিত ও সংক্ষিপ্ত বিধিতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদানের পূর্ণ অধিকার দেন।

বিধি মতে (১) প্রথমে প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা প্রার্থীর মস্তক মুণ্ডণ করিয়ে, (২) দাড়ি কামিয়ে, (৩) কষায় (গেরুয়া) বস্ত্রে দেহাবৃত করিয়ে, (৪) এক কাঁধে উত্তরাসঙ্গ (উপরে পরিধেয় চীবর বস্ত্র) রাখিয়ে, (৫) উপস্থিত ভিক্ষুর (উপাধ্যায়) উচ্চারিত বাক্যের অনুরূপ উচ্চারণ করতে তাকে নির্দেশ দিতে হবে। এ বিধিকে শাস্তা স্বয়ং **'তি-সরণ'** (ত্রিশরণ) বিধি নাম দেন।

এর পর বর্ষাবাসের পর প্রবারণা শেষ করে বুদ্ধ উরুবেলার সেনানিগমে পৌঁছে অগ্নিপূজারী তিন জটিল কাশ্যপ-ভাই উরুবেলা কাশ্যপ, নদী কাশ্যপ ও গয়া কাশ্যপ ও তাঁদের হাজার জটিল শিষ্যকে নানা প্রকারের ঋদ্ধিশক্তির প্রদর্শন করান। ঐ সব অশ্রুতপূর্ব অসাধারণ ঋদ্ধিশক্তির দর্শন করে অভিভূত হয়ে জটাবল্কলাদি সব নৈরঞ্জনা নদীতে ভাসিয়ে তিনবারে বুদ্ধের শরণাপন্ন হবার প্রার্থনা জানান।

'লভেয়্যাম ময়ং, ভন্তে, ভগবতো সন্তিকে পবজ্জং, লভেয়্যামউপসম্পদং।'
মহাবগ্গ/ বিনয়পিটক

উপসম্পদাদানের পর বুদ্ধ তাদেরকে নিয়ে গয়ার গয়াশীর্ষে (বর্তমান ব্রহ্মযোনি) পর্বতে যান। ঐ সব নতুন ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে আদিত্যপর্যায় নামক উপদেশ শোনান। উপদেশ শুনে তাঁরাও সবাই একসাথে অর্হৎ হন।

এ বিশাল ভিক্ষু-সংঘ সহ এবং বুদ্ধ মগধের রাজধানী রাজ-গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভ করান। পৌষ পূর্ণিমায় তাঁরা রাজগৃহের সীমান্তে অবস্থিত যষ্টিবন উদ্যানে (**লট্ঠিবনুয়্যানে**) সুপ্রতিষ্ঠিত চৈত্যে অবস্থান

করেন। এ সংবাদ শুনে রাজা বিম্বিসার তাঁর সভা পরিষদ ও বিশাল জনকায় সহ বুদ্ধদর্শনে যষ্টিবন উদ্যানে আসেন। বুদ্ধ তাদেরকে উৎসাহবর্ধক ও কল্যাণকারী ধর্মোপদেশ দেন। এ উপদেশ শুনে রাজা ও মগধবাসী নহুত প্রজাসহ ঐ আসনেই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হন। এদের সাথে অপর এক প্রতিষ্ঠিত নহুত মগধ-দেশবাসী বুদ্ধের উপাসক হন।

জীবনের পাঁচটি অভিলাষার অন্তিম চারটি আজ একে একে পূর্ণ হওয়ায় তিনি মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন---

"এসাহং, ভন্তে, ভগবন্তং সরণং গচ্ছামি ধম্মং চ,
ভিক্খু-সংঘং চ। উপাসকং মং, ভন্তে ভগবা, ধারেতু।"

মহাবগ্গ/ বিনয় পিটক

ঐ বলেই তিনি তৃপ্ত হলেন না। বিশাল ভিক্ষু-সংঘ সহ বুদ্ধকে তাঁর রাজপ্রাসাদে আগামী কালের অন্নগ্রহণ করার নিমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন-

"অধিবাসেতু মে, ভন্তে, ভগবা স্বতনায় ভত্তং সদ্ধিং ভিক্খু- সঙ্ঘেন।"

মৌন ভাব ধারণ করে বুদ্ধ তাঁর নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন। মৌন স্বীকৃতি পেয়ে রাজা অভিবাদনান্তে প্রদক্ষিণ করে বিদায় নেন।

তারপরদিন প্রাতে দর্শনার্থীগণ দলে দলে বুদ্ধদর্শনে সেখানে আসেন। দর্শনার্থীর সংখ্যা এতই বেড়ে যায় যে যষ্টিবন উদ্যান হতে রাজপ্রাসাদে যাবার পথে ঘাটে কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না। পূর্বাহ্নে বুদ্ধ সশিষ্য রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে তাঁকে পথে অনেক বেগ পেতে হয়। এ কারণে দেবরাজ ইন্দ্রের আসন উত্তপ্ত হয়। কারণ অনুসন্ধান করে ইন্দ্র জানতে পারলেন যে ঐ ভীড় ঠেলে বুদ্ধের পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। এতে তাঁর কাল-ভোজনের সম্ভাবনা

বিঘ্নিত হবে। তৎক্ষণাৎ তিনি (ইন্দ্র) অতিকায় দিব্য আভাযুক্ত মানবরূপ ধারণ করে বুদ্ধের সম্মুখে জনসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে আবির্ভুত হন।

বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণকীর্ত্তন করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। এ অদ্ভূত ঘটনা ঘটায় বিশাল জনতার দৃষ্টি মানবরূপী ইন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সব ভুলে গিয়ে ভীড়ও ক্রমশ মানবরূপী ইন্দ্রের অনুগমন করতে থাকে। ঐ অবসরে বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সংঘের রাজপ্রাসাদ যাবার পথও আপনা-আপনি বাধামুক্ত হতে থাকে। কিছু দূর যাবার পর জনসাধারণের অগোচরে মানবরূপী দেবরাজ ইন্দ্র অদৃশ্য হয়ে পড়েন।

রাজা সভাপরিষদবৃন্দ সহ রাজপ্রাসাদের বাইরে এসে বুদ্ধ- প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে আগু বাড়িয়ে প্রাসাদে নিয়ে আসেন। আদর-আপ্যায়ন ও সেবা-সৎকার দানের পর আহারের ব্যবস্থাপনায় তৈরী হন। রাজা স্বহস্তে সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য-সামগ্রী পরিবেশন করে তাঁদের পরিতৃপ্ত করান। পরিতৃপ্তি দানের পর অত্যধিক আনন্দে ও বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে কোথায় রাখবেন এ চিন্তায় পরম্পরাগত প্রথানুসারে জ্ঞাতি-প্রেতগণের উদ্দেশ্যে পুণ্য-প্রদানের কথা রাজা একেবারে ভুলে যান। রাজা তাঁর রাজ-পরিবারের প্রমোদ-উদ্যান 'বেণুবনে' বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের হিতার্থে সুখার্থে বিহার নির্মাণ করান। এর পর ভগবান বুদ্ধের হাতে বিহার দানের প্রতীকরূপে সোনার ভিঙ্কার-পাত্র হাতে নিয়ে জল ঢেলে বলেন---

"এতাহং, ভন্তে, বেলুবনং উয়্যানং
বুদ্ধপ্পমুখস্স ভিক্খু-সঙ্ঘস্স দম্মি।"

(ভন্তে ভগবান, এ বেণুবন উদ্যান বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের উদ্দেশ্যে দান করছি।)

ঐ অবসরে বেণুবন উদ্যানে অবস্থানরত ভিক্ষু-সংঘকে আহ্বান করে শাস্তা নির্দেশ দেন--- 'হে আয়ুষ্মানগণ, যদি কেহ ভিক্ষু-সংঘের উদ্দেশ্যে বিহার দান করেন তবে তা স্বীকার করবেন।'

ঐ রাতে কিছু প্রেত ভয়াবহ রূপ ধারণ করে বিম্বিসারকে দেখা দেয়। সাথে বিকট চীৎকারও করে। এতে রাজা ভীষণ ভয় পেয়ে যান। সে রাত তিনি ঘুমোতে পারেন নি। পর দিন ভোর হতে না হতেই ভীত-ত্রাস্ত রাজা বেণুবন বিহারে যান। সেখানে বুদ্ধের কাছে এ অসাধারণ চীৎকারের কারণ ও সম্ভাব্য ফলাফল কি জানতে চেয়ে বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন।

উত্তরে বুদ্ধ বলেন --

বিরানব্বই কল্প পূর্বে এ ধরাতলে ফুস্‌স বুদ্ধ জন্মেছিলেন। ঐ সময় জয়সেন নামে এক রাজা তাঁর পিতা ছিলেন। মা ছিলেন সিরিমা। তাঁর আরও তিন বৈমাত্রিক ভাই ছিলেন। রাজা একাই বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে প্রতিদিন দান দিতেন আর সেবা-সৎকার করতেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা এমনকি ঐ তিন বৈমাত্রেয় ভাইও বুদ্ধ এবং ভিক্ষু-সংঘের সেবা-শুশ্রুষার বা দানের সুযোগ পেত না। এতে রাজা ও রাণী ব্যতীত আর সকলেই দুঃখী ছিল। তারা ঐ রাজপুত্রদের সাথে গোপন পরামর্শ করে রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় এক কৃত্রিম বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল। বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে রাজা জয়সেন ঐ তিন রাজপুত্রকে সীমান্তে পাঠান। রাজপুত্রগণের প্রয়াসে অতি সহজেই বিদ্রোহ শান্ত হয়।

এতে রাজা সন্তুষ্ট হন। রাজা তাদের বর চাইতে বললে রাজপুত্রগণ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের সেবা-সৎকারের সুযোগ লাভের বর প্রার্থনা করেন। এতে রাজা প্রথমে অসম্মত হলেও রাজপুত্রগণের অনুরোধে

তিনি সে বর দিতে বাধ্য হলেন তবে এক শর্তে। শর্তটি এই যে রাজপুত্রগণের প্রত্যেকে কেবলমাত্র তিন মাস বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের সেবা করবেন। এ সুযোগ পেয়ে রাজপুত্রগণ প্রফুল্লিত চিত্তে এর প্রস্তুতি আরম্ভ করেন।

রাজপুত্রগণ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের আহার-বিহারের সমুচিত ব্যবস্থা করেন। এ কাজের তদারকির জন্যে কর্মাধ্যক্ষ ও ভাণ্ডারী নিযুক্ত করেন। ঐ তিন ভাই এক হাজার পরিষদ সহ চীবরধারী প্রব্রজ্যিত শ্রমণ হয়ে বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সংঘের সেবায় রত হন। কর্মাধ্যক্ষ তার এক অযুত পরিষদবর্গসহ এবং ভাণ্ডারী তার পত্নীসহ ধর্মীয় জীবন-যাপনে, নিত্য দানে ও পূজা-সৎকারে রত ছিলেন। তবে এ কাজে নিযুক্ত সেবকদের অনেকের ধর্মে কর্মে বিশ্বাস ছিল না। ত্রিরত্নে তাদের মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের উদ্দেশ্যে তৈরী খাদ্য-সামগ্রী হতে তারা কর্মাধ্যক্ষ ও ভাণ্ডারীর অগোচরে খেয়ে ফেলতো এবং নিজেদের সন্তানাদিকেও খাওয়াতো।

এ পাপকর্মের পরিণামে তারা নরকে আর কর্মাধ্যক্ষকে সস্ত্রীক ভাণ্ডারী এবং তাদের পরিষদবৃন্দ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবেই পাপীরা এক নরক হতে অন্য নরকে এবং ঐ পুণ্যবানেরা এক স্বর্গ হতে অন্য স্বর্গে জন্ম নিয়ে বিরানব্বই কল্প অতিবাহিত করেন।

ভদ্রকল্পের কাশ্যপ বুদ্ধের সময় ঐ পাপীরা প্রেতলোকে জন্মান। এ প্রেতলোকের বহু প্রেতকে মনুষ্যলোকে তাদের আত্মীয়দের মাধ্যমে বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের উদ্দেশ্যে দেওয়া দানের পরিণামে পুণ্যদানের পরিণামে নারকীয় জীবন হতে মুক্তি পেতে দেখে ঐ প্রেতরা কখন মুক্ত হবেন জানার উদ্দেশ্যে কাশ্যপ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন।

তাদের আশ্বাসন দিয়ে কাশ্যপ বুদ্ধ বলেন- 'কিছুকাল পর এক বুদ্ধ

উৎপন্ন হবেন। তাঁর নাম হবে গৌতম বুদ্ধ। ঐ বুদ্ধের সময় তোমাদের এক জ্ঞাতি মগধদেশের রাজা হবেন। ঐ রাজার নাম হবে বিম্বিসার। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে দেওয়া দানের পুণ্য তিনি তোমাদের হিতার্থে দান করবেন। এতেই তোমরা প্রেতযোনি হতে মুক্তি পাবে।'

এ আশ্বাস ও বিশ্বাস নিয়ে ঐ প্রেতরা প্রেতলোকের যারপরনাই দুঃখ আরও এক বুদ্ধান্তরকাল ভোগ করে। এ কল্প-কাল দুর্ভোগের পর জম্বুদ্বীপে গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব হয়। ঐ দিন রাজপুত্র সপরিষদ দেববিমান হতে চ্যুত হয়ে বর্তমান মগধের ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম নেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারা তিন ভাই উরুবেলাকাশ্যপ, নদীকাশ্যপ ও গয়াকাশ্যপ নামে জটাধারী অগ্নিপূজারী সন্ন্যাসী হন। এরাই হলেন আমার এ তিন প্রখ্যাত শিষ্য।

ঐ ভাণ্ডারী ছিলেন মগধ রাজ্যের বর্তমান মহাশ্রেষ্ঠী বিশাখ। তার স্ত্রী ছিলেন বর্তমানের ধর্মদিন্না নামে শ্রেষ্ঠী-কন্যা। আর ঐ কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন আপনি মগধরাজ বিম্বিসার। ঐ কর্মাধ্যক্ষের সভাপরিষদরা ছিলেন আপনার বর্তমান রাজ-পরিবার। ঐ প্রেতরা বিরানব্বই কল্পকাল ধরে নারকীয় জীবনের দুর্ভোগ করে আসছে। এ প্রেতযোনি হতে মুক্তি লাভের একমাত্র আশারূপী আলোর উৎস আপনি। জগতে বুদ্ধোৎপত্তি ও আপনার রাজ্যাভিষেক হবার সাথে সাথে তাদের আশা বলবতী হতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের রাজগৃহের প্রথম আগমন উপলক্ষে দেওয়া দানের পুণ্যাংশ তাদের প্রেতযোনি হতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বিতরণ না করায় এবং এমনকি তাদের স্মরণও না করায় তারা যারপরনাই হতাশান্বিত হন। জ্ঞাতি-প্রেতগণের প্রতি আপনার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তারা এধরনের অসাধারণ ভয়াবহ চীৎকার করেছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কি করণীয় তা রাজা জানতে চাইলে প্রেতরা যাতে তাদের প্রেতযোনি হতে সহসা মুক্তিলাভ করে তার জন্যে দানজনিত পুণ্য প্রদানের পরামর্শ দেন বুদ্ধ।

বুদ্ধের পরামর্শে রাজা প্রেতযোনিতে জাত ঐ প্রেতাত্মীয়গণের উদ্দেশ্যে পুণ্যাংশ প্রদান করেন। প্রেতগণও ঐ সময় পুণ্য প্রাপ্তির আশায় রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছিল। রাজার প্রদত্ত পুণ্য তারা অত্যধিক আনন্দের সাথে গ্রহণ করে। পুণ্যদানের প্রতীকরূপে জল ঢালার সাথে সাথে প্রেতদের স্নানার্থে স্বচ্ছ জলযুক্ত পদ্মপূর্ণ পুকুরের সৃষ্টি হয়। ঐ পুকুরে স্নান করে তারা দিব্য দেহ লাভ করে। তবে তাদের দেহে কোন প্রকারের বস্ত্র ছিল না। শাস্তার পরামর্শে মহার্ঘ্য চীবরাদি দান দেবার সাথে সাথে তারা দিব্যবস্ত্র লাভ করে। আহার্য-বস্তু দানজনিত পুণ্য-দানের সাথে সাথে তারা দিব্য ভোগ্যবস্তু লাভ করে। তদনুরূপ শয়নাসন ও আস্তরণাদি দান দেবার পরিণামে সে ধরনের দিব্য শয়নাসন ও আস্তরনাদি প্রাপ্ত হয়ে তারা সুখী হয়। বুদ্ধ তাঁর ঋদ্ধিশক্তির প্রয়োগ করে রাজাকে তাঁর ঐ সব প্রেতাত্মীয়গণের পূর্বাপর অবস্থার ভেদ একে একে দেখান। এতে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হন। আহারের পর রাজা ও রাজপরিবারের সকলের আনন্দ বর্দ্ধনার্থে, হিতার্থে ও সুখার্থে তিরোকুড্ডসুত্তের উপদেশ দেন। উপদেশ দানের পর বুদ্ধ সশিষ্য বেণুবনে ফিরে আসেন।

ঐ বিহারে অবস্থানকালেই শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা এবং অরহত্ব প্রাপ্তি ঘটে। এখানেই শাস্তা এ দুজনকে তাঁর অগ্রশ্রাবকের পদে সম্মানিত করেন। অঙ্গ ও মগধ সাম্রাজ্যের অভিজাত কুলপুত্রগণ দলে দলে বুদ্ধের পবিত্র শাসনে প্রব্রজ্যিত ও উপসম্পন্ন হয়ে শাসনশ্রী বর্দ্ধন করেন। অর্হৎপদ প্রাপ্ত হয়ে অঙ্গ-মগধাদি জনপদের গ্রামে গ্রামে নগরে প্রান্তরে বুদ্ধের গৈরিক অর্হৎধ্বজা

উড়ান। এভাবে তাঁর অর্হৎ ভিক্ষু-শিষ্যের সংখ্যা তখন গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দশ হাজারে।

অন্যদিকে পুত্র দর্শনাভিলাষী মহারাজ শুদ্ধোদন তাঁর পুত্র বুদ্ধ হয়েছেন শুনে একজন দুজন করে ক্রমে নয়জন দূতীকে এক এক হাজার কপিলবাসী অনুচরবৃন্দসহ বুদ্ধকে কপিলবস্তু আসার নিমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে রাজগৃহে পাঠান। রাজগৃহের বেণুবন বিহারে প্রবেশ করতেই বুদ্ধের দিব্য ব্যক্তিত্বে তাঁরা সবাই অভাবিতরূপে প্রভাবিত হন। বুদ্ধ সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ভিক্ষু-সংঘ ও মগধবাসী ধর্মরস-পিপাসুজনের উদ্দেশ্যে দেওয়া বুদ্ধের উপদেশ শুনে তারা সবাই অর্হৎ হয়ে পড়েছিলেন। শুধু তা নয়, অর্হৎপদ প্রাপ্ত হয়ে তারা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থীও হয়ে পড়েছিলেন। প্রব্রজ্যাপ্রার্থীদের প্রব্রজিত করে বুদ্ধ তাঁর মহাকরুণাময় মৈত্রী চিত্তের পরিচয় দেন। উপসম্পদাপ্রাপ্তির পর ঐ ভিক্ষুগণও রাজা শুদ্ধোদনের অনুরোধের কথাকে অধিক গুরুত্ব না দিয়ে পরে কখনও বলবেন ভেবে শান্ত হয়ে যান।

একের পর এক এতজনকে এভাবে ফিরে আসতে না দেখে মহারাজ শুদ্ধোদন আশ্চর্যচকিত হওয়ার সাথে 'অনিশ্চিত মৃত্যুর পূর্বে একবারও কি পুত্রদর্শন লাভ করে শান্তিতে মারা যেতে পারবো না?'--- চিন্তায় অধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েন। শেষে কুমার সিদ্ধার্থের জন্মদিনেই জাত ও তাঁর বাল্যবন্ধু রাজন্ত-পুরের এবং রাজার একমাত্র অত্যন্ত বিশ্বাসী মন্ত্রী কালুদায়ীকে এক হাজার অনুচরসহ রাজগৃহে গিয়ে বুদ্ধকে নিয়ে আসার প্রস্তুতি নিতে বলেন। এত বছর পর তাঁর বাল্যবন্ধু কুমার সিদ্ধার্থের দর্শন লাভের সুযোগ পেয়ে কালুদায়ী তো আহ্লাদে আটখানা। এর মধ্যে তার পূর্ববর্ত্তী নয়জন দূতের নেতৃত্বে নয় হাজার কপিলবস্তুবাসী বুদ্ধের সান্নিধ্যে এসে ভিক্ষু-ধর্ম আলিঙ্গনের সংবাদ পেয়েছিলেন। এ সংবাদ শুনে তাঁর হৃদয়েও বৈরাগ্য ভাবের

উদয় হয়। রাজগৃহ গিয়ে বুদ্ধকে কপিলবস্তু নিয়ে আসার দায়িত্ব তাকে দেওয়া হলে তিনিও বুদ্ধ সান্নিধ্যে প্রব্রজ্যিত ও উপসম্পন্ন হবার শর্ত রাখেন। শর্তে সম্মত হওয়ায় কালুদায়ী মহানন্দে সানুচর পরিবৃত হয়ে রাজগৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

হেমন্ত ঋতুর সমাপ্তির সাত আট দিন পর তাঁরা দীর্ঘ পথচারণের পর রাজগৃহে পৌঁছান। তাঁদের বেণুবন বিহারে প্রবেশকালে বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দানে তন্ময় ছিলেন। শ্রোতাগণও গভীর আগ্রহে ধর্মোপদেশ শুনছিলেন। ধর্মসভার কোথাও অন্য কোন প্রকারের সাড়া শব্দ ছিল না। বেণুবন বিহারের গুরুগম্ভীর পরিবেশ, বুদ্ধের অতুলনীয় দিব্যরূপ ও মধুর কণ্ঠধ্বনি এবং মনমোহক ধর্মোপদেশের বিষয়বস্তুর মর্মার্থ বুঝতে পেরে কালুদায়ী ও তাঁর হাজার অনুচরবৃন্দ কোন প্রকারের ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে ধর্মসভার একান্তে দাঁড়িয়ে ধর্ম শ্রবণ করছিলেন। দাঁড়িয়ে ধর্মশ্রবণকালেই তাঁরাও অরহত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন। ধর্মসভার শেষে এবার তাঁরা বুদ্ধের পাশে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বুদ্ধকে অভিবাদন করলেন। এর পর তাঁরা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থী হন। প্রার্থনানুসারে বুদ্ধ 'আসো, ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করে তাঁদেরকে দীক্ষা দেন। এতদিনে নতুন নতুন সবুজ পাতায় রঙবেরঙের ফুলে সুশোভিত অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে কপিলবস্তুবাসী তথাগতের কপিলবস্তু গমন ও জ্ঞাতিসম্মেলনের আয়োজনের উপযুক্তকাল হয়েছে ভেবে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে কালুদায়ী বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ষাটটি গাথায় যাত্রাকাল ও যাত্রাপথের মনোরম বর্ণনা দিয়ে তথাগতের হৃদয়ে স্বগৃহে যাবার চিত্ত উৎপত্তির প্রেরণা দেন। পরে মহারাজ শুদ্ধোদনের পুত্র দর্শনের মহান অভিলাষার কথা ব্যক্ত করে তাঁকে জ্ঞাতি কর্তব্য পালনের অনুরোধ জানান।

কপিলবস্তু গিয়ে স্বজনপরিজনদের দেখে আসার অনুরোধে বুদ্ধ সম্মতি প্রদান করেন। সাথে অন্য বিশ হাজার ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুদেরও অনুগামী হবার প্রস্তুতি নিতে বলেন।

অনতিবিলম্বে একদিন বিশ হাজার ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুদের নিয়ে রাজগৃহ হতে কপিলবস্তুর উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্থান করেন। রাজগৃহ হতে কপিলবস্তুর দূরত্ব ষাট যোজন। প্রতিদিন এক যোজন দূরত্ব মন্থর গতিতে অতিক্রমনের পর তাঁরা বিশ্রাম নিতেন। পরদিন পুনরায় যাত্রারম্ভ করতেন। এভাবে দু'মাস পর তাঁরা পৌঁছান।

যাত্রা আরম্ভ হতেই কালুদায়ী তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে কপিলবস্তু গিয়ে রাজার সামনে আবির্ভুত হন। কালুদায়ীকে ভিক্ষু বেশে, তদুপরি আকাশমার্গে তাঁর সম্মুখে হঠাৎ উপস্থিত হতে দেখে রাজা বিস্ময়াভিভূত হন। কালুদায়ীকে তাঁর দেওয়া শর্ত অনুসারে ফিরে আসতে দেখে পুত্র-দর্শনের আশা বলবতী হয়, আর রাজার হৃদয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ তরঙ্গ সঞ্চারিত হয়। সসম্মানে এক মহার্ঘ্য আসনে কালুদায়ী ভিক্ষুকে বসান। নিজের জন্যে পরিবেশিত আহার্য খাদ্য-ভোজ্য-সামগ্রী দিয়ে তাঁর ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করে সেখানেই অন্নগ্রহণের অনুরোধ করেন। উত্তরে কালুদায়ী ভিক্ষু বলেন- মহারাজ, এখনি বুদ্ধের কাছে এ আহার পৌঁছিয়ে আসছি। তিনি এ অন্ন গ্রহণ করবেন। প্রভু, শাস্তা এখন কোথায়? জানতে চাইলে- 'শাস্তা আজ রাজগৃহ হতে কপিলবস্তুর উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভ করেছেন'- কালুদায়ী ভিক্ষু মহারাজকে জানান।

কালুদায়ীর মুখে এ প্রীতিবর্দ্ধক সুসমাচার শুনে মহারাজের আর আনন্দের সীমানা থাকে না। আনন্দ প্রফুল্লিত চিত্তে কালুদায়ী ভিক্ষুকে অনুরোধ করেন, ভন্তে, আপনি এ অন্ন এখানেই গ্রহণ করুন। শাস্তার

জন্যে পুনরায় পাত্র পূর্ণ করে অন্ন দান করবেন। শুধু আজ নয়, যতদিন শাস্তা কপিলবস্তু নগরে এসে না পৌঁছান আপনি ততদিন শাস্তার জন্যে অন্ন আমার কাছ হতে নিয়ে যাবেন। কালুদায়ী ভিক্ষু সম্মতি দিলেন।

অন্নগ্রহণ শেষ হলে রাজা নিজে ভিক্ষাপাত্র ধুয়ে শাস্তার উদ্দেশ্যে সুস্বাদু অন্নে পরিপূর্ণ করে ভিক্ষুর হাতে পাত্র তুলে দেন। আর বলেন- 'শাস্তাকে এ অন্ন গ্রহণের অনুরোধ জানাবেন'। রাজা ও অন্যান্য উপস্থিত সকলের সম্মুখে কালুদায়ী ভিক্ষু ভিক্ষা-পাত্রটি উপরে তুলে আকাশে ছুঁড়ে দিলেন। নিজে আকাশে উড়ে গিয়ে অল্পক্ষণ পরেই শাস্তার হাতে অন্ন-পূর্ণ পাত্রটি তুলে দেন। শাস্তা পিতার দেওয়া অন্ন খেলেন।

প্রতিদিন পূর্বাহ্নে কালুদায়ী আকাশমার্গে এসে শাস্তা কতদূর এগিয়েছেন তা রাজাকে জানিয়ে দিতেন। অন্ন গ্রহণের পর রাজার দেওয়া অন্ন প্রতিদিন তিনি শাস্তার হাতে তুলে দিলে শাস্তা তা গ্রহণ করতেন।

এভাবে কয়েকদিন যেতে না যেতেই রাজপরিবারে ও কপিলবস্তুর নগরে-প্রান্তরে কালুদায়ী ও শাস্তার স্বদেশ আগমন বার্ত্তা ও গুণকীর্ত্তন দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। শাস্তার গুণকীর্ত্তনের মাধ্যমে তিনি শাস্তার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন।

কপিলবস্তুতে আসলে শাস্তাকে কোথায় রাখা হবে এ চিন্তায় রাজা-প্রজা-মন্ত্রী সবাই চিন্তিত হলেন। এক বিশাল জনসভায় দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ন্যাগ্রোধ শাক্যের রমণীয় ন্যাগ্রোধারামে তথাগতকে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ন্যাগ্রোধারামের সাজসজ্জা ও অলংকরণ হয়। এরপর শাস্তাকে জাঁকজমকপূর্ণ ও শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে

আসার উদ্দেশ্যে পথও অলংকৃত হল। নানা ধরণের বস্ত্রাভূষণে বিভূষিত বালক-বালিকাদের শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে, এরপর নগরের যুবক-যুবতীদের দ্বিতীয় সারিতে, এরপর রাজকুমার-রাজকুমারীদের তৃতীয় সারিতে, সবশেষে আর চতুর্থ সারিতে বয়োবৃদ্ধরা হাতে নানা ধরণের পূজা-সৎকারের সামগ্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। পূর্ব নির্ধারিত সময়ে ভগবান বুদ্ধ বিশ হাজার ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু-পরিবৃত হয়ে কপিলবস্তু নগরে পৌঁছান। পৌঁছে সুপ্রজ্ঞপ্ত আসনে তথাগত বুদ্ধ আসীন হন।

অতি মানাভিমানবশত শাক্যকুলের বয়স্ক নাগরিকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকেন--- 'বুদ্ধ হলে কি হবে? সে তো আমাদের বয়কনিষ্ঠ সিদ্ধার্থ কুমার।' বয়কনিষ্ঠ সিদ্ধার্থকে নমস্কার করা তাদের পক্ষে শোভা পাবে না ভেবে বয়কনিষ্ঠ যুবক-যুবতীদের সামনে রেখে 'ভক্তিভরে তোমরা অভিবাদন করো' নির্দেশ দিয়ে বললেন 'আমরা তোমাদের পেছনে আছি।'

বুদ্ধ শাক্যকুলোদ্ভুত বয়স্ক আত্মীয়স্বজনগণের মনোভাব বুঝতে পেরে তাদের মানাভিমান ভঞ্জনের উদ্দেশ্যে ঋদ্ধিশক্তি প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ধ্যানস্থ হয়ে প্রথমে ঋদ্ধিশক্তির উৎপাদনকারী চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। আকাশে উঠে উপস্থিত সকলের মাথায় তিনি তাঁর পদরেণু ছড়াতে থাকেন। এরপর তিনি যমকপ্রাতিহার্য তুল্য এক অসাধারণ অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তির প্রদর্শন করেন।

এসব অবিশ্বাস্য অদ্ভুত ঘটনা দেখে মহারাজ অঞ্জলীবদ্ধ করে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলেন- ভন্তে, আপনার জন্মদিনে ঋষি কালদেবলের চরণযুগল বন্দনার উদ্দেশ্যে আপনাকে আনা হলে, সংযোগবশত আপনার চরণযুগলই দেবল ঋষির মাথার উপরে স্থাপিত

দেখে আমি আপনাকে বন্দনা করেছিলাম। আপনার প্রতি সেটা আমার প্রথম বন্দনা ছিল। এরপর একবার হল-কর্ষণোৎসব সমারোহে জামগাছের ছায়ায় রাখা সাজানো বিছানায় আপনি ধ্যানমগ্ন থাকাকালে কয়েকপ্রহর অতিক্রান্ত হলেও গাছের ছায়ার কোন পরিবর্তন না দেখে দ্বিতীয়বার আমি আপনাকে বন্দনা করেছিলাম। আর আজ তৃতীয়বার আপনাকে বন্দনা করছি।

রাজাকে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম করতে দেখে বয়োবৃদ্ধ কপিলবস্তুবাসী নাগরিক এবং জ্ঞাতিজনও আর প্রণাম না করে থাকতে পারে নি। সকলের মনে শ্রদ্ধোৎপাদন করে পুনরায় তিনি আকাশ হতে নেমে নিজ আসনে এসে বসেন।

ঐ অবসরে এক বিরাট জ্ঞাতি-সম্মেলন ঘটে। সবাই একত্রে বসে জ্ঞাতি-সম্মেলনের আনন্দ উপভোগ করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ আকাশে মহা-অকালমেঘ দেখা দেয়। অনতিবিলম্বে মেঘ-গর্জনের সাথে ভীষণ বৃষ্টি হয়। ধরণীর ধুলোবালি ধুয়ে মুছে যাওয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি নির্মল হয়। যাদের মনে ঐ মুষল-ধারায় ভেজার ইচ্ছা হয়েছিল তারা ভিজেছে, আর যাদের ভেজার ইচ্ছে ছিল না তাদের দেহ বা কাপড়চোপরে কণামাত্র বৃষ্টিকণা পড়ে নি। এ ধরণের অভূতপূর্ব কাণ্ডকারখানা দেখে সবাই 'কি অদ্ভূত, কি অদ্ভুত ব্যাপার' বলতে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে তথাগত বুদ্ধ অতীত কথা উত্থাপন করে এক ধর্মোপদেশ দেন।

রাজাপ্রজা বা কপিলবস্তুবাসী সকলেই বুদ্ধ-দর্শন, ধর্মোপদেশ শ্রবণ ও জ্ঞাতী-সম্মেলনে অভিভূত হয়ে ছিলেন। ফলে বুদ্ধ বা ভিক্ষু-সংঘের আগামী দিনের আয়োজনের ব্যবস্থা কোথায় বা কিভাবে হবে তার

দায়িত্ব ভুলে গিয়ে তারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে নিজ নিজ গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

ন্যাগ্রোধারামে রাত্রি যাপনের পর পরদিন পূর্বাহ্নে ভিক্ষাপাত্র হতে বুদ্ধ বিশ হাজার ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে নগরের প্রধান প্রবেশদ্বারে দাঁড়ান। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পূর্ব পূর্ব অতীত বুদ্ধগণের ভিক্ষা গ্রহণের প্রথা স্মরণ করে জানতে পারেন অতীতে কেহই সোজাসুজি নিজ পৈতৃক বাসস্থানে যাননি। পৈতৃক বাসস্থানে যাবার পথে অতীতের সব বুদ্ধগণই ধনী-নির্ধন নির্বিচারে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি ঘরে গিয়ে (সপদান প্রথায়) ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করেন। এটি জেনে তিনিও বুদ্ধকুলের পরম্পরা রক্ষার্থে সপদান-প্রথায় ভিক্ষান্ন সংগ্রহে অগ্রসর হন।

ক্রমান্বয়ে কয়েকটি ঘরে ভিক্ষান্ন সংগ্রহার্থে যেতে না যেতেই সমস্ত কপিলবস্তু নগরবাসীর মধ্যে তাদের জ্ঞাতী রাজকুমার সিদ্ধার্থ নাকি ভিক্ষু-সংঘ পরিবৃত হয়ে ঘরে ঘরে ভিক্ষে করছেন, সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ে। অধীর আগ্রহে নিজ নিজ কাজকর্ম ছেড়ে কেহ পথের পাশে, এসে কেহ দরজায়, কেহ জানালায় আর কেহ দোতালা তেতালার বারান্দায়, অলিন্দে দাঁড়িয়ে এ অভিনব দৃশ্য দেখতে থাকেন।

রাজান্তপুরেও এ সংবাদ পৌঁছে। সংবাদ পেতেই রাহুল-মাতা যশোধরা রাজপ্রাসাদের খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে যা দেখলেন তাতে তিনি কিছুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে হতবাক না হয়ে পারলেন না। এ দেখার যেন শেষ নেই। এ দেখার যেন তৃপ্তি নেই। সে কি অপরূপ দিব্য সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে বুদ্ধের শরীরে। মহাভিনিষ্ক্রমণ-পূর্বের সিদ্ধার্থ এ নয়। ইনিই কি সেই রাহুল-পিতা সিদ্ধার্থ? ইনিই কি সেই রাহুল-পিতা যিনি সোনার শিবিকায় বসে নগর ভ্রমণ করতেন? এ চিন্তায় নিমগ্ন যশোধরা কিং-কর্ত্তব্য-বিমুঢ়া হয়ে অনেকক্ষণ কাটিয়ে

ফেলেন। পারমিতাগুণে দেদীপ্যমান তথাগত বুদ্ধও নীলাকাশে শত সহস্র নক্ষত্ররাজি পরিবৃত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল পীত- বস্ত্রধারী বিশ হাজার ভিক্ষুগণ পরিবৃত হয়ে আপন পৈতৃক বাসস্থান রাজপ্রাসাদের কাছে মন্থর গতিতে এগিয়ে আসেন। অত্যধিক নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বুদ্ধের অপূর্ব ব্যাম-প্রভায় সমুজ্জ্বল তাঁর আশি প্রকার অনুব্যঞ্জনমণ্ডিত ও বত্রিশ প্রকারের মহাপুরুষ লক্ষণগুলি পূর্বের চেয়েও অধিক স্পষ্টতর হয়ে পড়ে যশোধরার কাছে। তাঁর আপাদমস্তক তাকিয়ে যশোধরার সারা শরীরে এক রোমাঞ্চকর শিহরণ জাগে। অনায়াসে তিনি গুন্‌গুন্‌ করে তথাগতের গুণগান করেন। তা নরসিংহগাথা নামে অতি সুবিদিত।

গাথা শেষে বুদ্ধকে একেবারে রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে দেখে দৌড়ে শ্বশুরমহোদয়কে জানান- পিতা, আপনার পুত্র ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে আসছেন। শুনেই মহারাজ শুদ্ধোদন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে দেহাবরণ ঠিকভাবে না সামলেই রাজপ্রাসাদের প্রধান দরজায় এসে উপস্থিত হন। ততক্ষণে তথাগত বুদ্ধও শ্রাবক-সঙ্ঘ সহ সেখানে উপস্থিত হন। মহারাজা অঞ্জলীবদ্ধ করে প্রণামান্তে নিবেদন করেন- প্রভু, নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে আমায় এভাবে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? আপনি কিভাবে চিন্তা করলেন যে আমি এত সব ভিক্ষুর অন্নদানে অসমর্থ? এভাবে ভিক্ষাগ্রহণ করা আমাদের কুলপরম্পরার বিপরীত নয় কি?

বুদ্ধ - "মহারাজ, আমি কুলপরম্পরাই পালন করেছি।"

'ভন্তে, আমাদের ক্ষত্রিয় রাজকুলের কেহ এভাবে কোনদিন ভিক্ষে করেনি।

বুদ্ধ - হ্যাঁ মহারাজ, আপনার ক্ষত্রিয় রাজকুলের কেহ কোনদিন ভিক্ষে

করে নি। একথা অতি সত্যি, কিন্তু আমার কুল তো আপনার কুল হতে ভিন্ন। আমার কুল বুদ্ধ-কুল। দীপঙ্করাদি অতীত বুদ্ধ হতে কাশ্যপ বুদ্ধ অবধি বুদ্ধ-কুলের সবাই ভিক্ষান্ন সংগ্রহের সম্যক্ জীবিকায় জীবনযাপন করেন। আমি এ বুদ্ধ-কুলের বংশধর। এরপর ঐ দাঁড়ানো অবস্থাতেই মহারাজার উদ্দেশ্যে উপদেশচ্ছলে বলেন-

উত্তিট্ঠ নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ।

১৬৮ গাথা ধম্মপদ

উঠুন! প্রমত্তময় জীবন বর্জন করে সুন্দরভাবে ধর্মাচরণ করুন। ধর্মাচরণকারী ইহলোক, পরলোক এ উভয় লোকেই সুখে শয়ন করে কাল যাপন করেন।

এগাথা শ্রবণমাত্রেই মহারাজা তাঁর ঐ দাঁড়ানো অবস্থাতেই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্তির পর মহারাজ শুদ্ধোদন বুদ্ধের হাত হতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করেন। সশিষ্য বুদ্ধকে রাজ-অন্তপুরে নিয়ে যান। সুস্বাদু খাদ্য-ভোজ্যদ্রব্য দান করে তাঁদের পরিতৃপ্ত করেন।

অন্নদানের পর্ব শেষে (করার পর) রাজ-অন্তপুরবাসিনী মহিলারা একে একে বুদ্ধের দর্শনার্থে আসেন। প্রণামান্তে তারা আশীর্বাদ নিয়ে চলে যান। যশোধরার নিকট জ্ঞাতী ও পরিচারিকাবৃন্দ বারবার এসে যশোধরাকে বুদ্ধ-দর্শনের অনুরোধ করলেও তিনি তাঁর শয়নকক্ষ ছেড়ে বাইরে এলেন না। অনুরোধের উত্তরে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে যশোধরা চিন্তে করলেন- 'যদি আমার মধ্যে কোন প্রকারের গুণ থেকে থাকে, তবে বুদ্ধ নিজেই আমার কাছে আসবেন। আসলে তাঁকে যথেচ্ছা প্রণাম করবো।' যশোধরার অভিমানের মর্মার্থ উপলব্ধি করে

আর তাঁর নির্মল কোমল মনে কোন প্রকারের ক্ষোভ সৃষ্টি না করার উদ্দেশ্যে দুজন প্রধান শিষ্যকে নিয়ে যশোধরার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন। প্রবেশকালে তিনি শিষ্য দুজনকে নির্দেশ দেন যেন তাঁরা যশোধরাকে যথেচ্ছ মনের আবেগ ব্যক্ত করার প্রয়াসে বাধা না দেন। অন্তপুরে প্রবেশ করতেই বিগত সাত বছরের তীব্র বিরহ-বেদনাজাত ভাবাবেগ সংবরণ করতে না পেরে যশোধরা বুদ্ধের কোমল কমল শ্রীচরণযুগল বেশ কিছুকাল অবিরাম ঝরা নয়ন নীরে (অশ্রু জলে) ভিজিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে চুমু খেতে খেতে শান্ত হয়ে যান। অবিকম্পিত চিত্তে তথাগত বুদ্ধ যশোধরার আধ্যাত্মিক মঙ্গল কামনায় আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। রাহুলমাতা যশোধরা প্রকৃতিস্থ হলে তথাগত বুদ্ধ বাহিরের ঘরে এসে বসেন। মহারাজ শুদ্ধোদন আপন পুত্রবধু যশোধরার প্রশংসা করলে তথাগত বুদ্ধ ঐ প্রসঙ্গে অতীত কথা আহরণ করে 'চন্দ্র-কিন্নর জাতক' কথার বর্ণনা করেন। বর্ণনা-দানকালে তিনি বলেন যশোধরা শুধু এজন্মেই যে নিজেকে সংরক্ষিত রেখেছেন তা নয়, অতীতে গহন অরণ্যে একাকী থাকাকালেও নিজেকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন।

পিতাকে উপদেশ দিয়ে বলেন-

"ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্চরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি, অস্মিং লোকে পরম্হি চ।"

১৬৯ গাথা ধম্মপদ

উঠুন। অধর্মে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হউন। সদ্ধর্ম-আচরণকারী ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই সুখে শয়ন (কালযাপন) করেন।

উপদেশ শুনে মহারাজা শুদ্ধোদন তৎক্ষণাৎ সকৃদাগামী-ফলে প্রতিষ্ঠিত

হন। এরপর শাস্তা ন্যাগ্রোধারামের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

পরদিন কপিলবস্তু নগরী এবং বিশেষত রাজপরিবার বিবিধ আনন্দধ্বনিতে মুখরিত ছিল। কারণ সেদিনই বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই রাজকুমার নন্দের রাজ্যাভিষেক, গৃহপ্রবেশ ও বিবাহোৎসবের সমারোহ চলছিল।

সেদিন পূর্বাহ্নে বুদ্ধ রাজকুমার নন্দের বাসভবন হতে অন্নগ্রহণের পর আসন ছেড়ে উঠলে নন্দও পেছনে পেছনে বাসভবনের দরজা অবধি বুদ্ধকে বিদায় দিতে আসেন। শাস্তা তাঁর দিব্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নন্দের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা জানতে পেরে মুখে কিছু না বলে, নিজের ভিক্ষাপাত্র তাঁর হাতে তুলে দেন, আর বলেন- ঐ প্রব্রজ্যা গ্রহণেই মানুষের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। নন্দও এই কিছুদূরে এগিয়ে গেলে হয়ত শাস্তা ভিক্ষাপাত্র তাঁর হাত হতে নিয়ে ফেলবেন ভেবে আনমনে শাস্তার অনুগমন করতে থাকে। নন্দকে অবোধ বালকের ন্যায় শাস্তার অনুগমন করতে দেখে তাঁর সদ্য বিবাহিতা জনপদ-কল্যাণী নন্দা জানালা হতে গলা বাড়িয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সাথে বলে--- 'স্বামী, শীঘ্র ফিরে এসো'। নন্দ কিন্তু এভাবে শাস্তার অনুগমন করে ন্যাগ্রোধারামে পৌঁছোয়। তার পরদিন শাস্তা তাঁকে উপদেশ দিয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণের প্রেরণা দেন। নন্দ শাস্তার ধর্মদেশনায় প্রেরিত হয়ে ভিক্ষু-ধর্ম বরণ করেন।

এভাবে প্রতিদিনই শাস্তা কপিলবস্তুবাসী এবং বিশেষত বিশিষ্ট পরিবারের কাউকে না কাউকে ভিক্ষুধর্ম বরণের প্রেরণা দিয়ে ভিক্ষুত্বদানের প্রবল অভিযান চালিয়েছিলেন। এদিকে রাজপরিবারে নন্দের ভিক্ষুত্ব বরণের পর রাহুল ছাড়া রাজ্যাভিষেক প্রাপ্তির যোগ্যতা আর কারও ছিল না। তদুপরি সিদ্ধার্থের জন্মের সাথে যে সব

অলৌকিক দিব্য সম্পত্তির উৎপত্তি রাজপরিবারে হয়েছিল, সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণের সাথে সে সবও আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।

রাজপরিবারে যাতে সে সব ধনের পুনরাগমন হয় এ আশায় রাহুলমাতা দেবী যশোধরা বুদ্ধের কপিলাবস্তুর আগমনের সপ্তম দিন সাত বছরের বালক রাহুলকে রাজকুমারের ন্যায় মূল্যবান বস্ত্রাভূষণে সাজিয়ে বুদ্ধের কাছ হতে তাঁর পিতার চক্রবর্তী-সম্পত্তি চেয়ে নেবার জন্যে তৈরী করে রেখেছিলেন।

রাজবাড়ীতে সেদিনের অন্নগ্রহণের পর বুদ্ধ অতীত বুদ্ধগণের প্রথানুসারে সেদিনও দানানুমোদনমূলক উপদেশ দিচ্ছিলেন। মায়ের সংকেতে রাহুল কুমার বুদ্ধের কাছে যান। বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে এই প্রথম পিতার স্নেহ পায়। এতে সে পরম প্রীতির অনুভব করে। প্রীতি প্রফুল্লিত মনে অনায়াসে সে বলে ফেলে **'সুখা তে- সমণচ্ছায়া' তি**। অর্থাৎ আপনার ছায়াও, হে শ্রমণ, সুখকর। এর সাথে আরো অনেককাল স্বভাব সুলভ কথা বলে বুদ্ধের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে সে। দানানুমোদনের পর বুদ্ধের প্রস্থানকালে রাহুল কুমার থেমে থেমে আবদারের সুরে আবার বলে- 'হে শ্রমণ, আমায় পৈতৃক সম্পত্তি দিন, পৈতৃক সম্পত্তি দিন' (**দায়জ্জং মে দেহি**)। এভাবে বলে বলে সে শাস্তার পেছনে পেছনে যেতে থাকে। শাস্তাও তাকে কোন প্রকারের বাধা দেন নি। রাজপরিবারের অনেকে রাহুলকে বাধা দিলেও রাহুল একেবারে নাছোড়বান্দা। মায়ের আদেশ রক্ষার্থে পৈতৃক ধন আদায় করতে যেন সে কটিবদ্ধ। বুদ্ধের সাথে সে ন্যাগ্রোধারামে এসে পৌঁছে।

বুদ্ধ চিন্তা করেন--- এ অবোধ বালক যে পৈতৃক সম্পত্তি চাচ্ছে তা দুঃখবর্দ্ধক। শুধু দুঃখ-বর্দ্ধকই নয়, তা সংসার-বর্দ্ধকও। তদুপরি ঐ

সম্পত্তি আমি সাত বছর পূর্বে মহাভিনিষ্ক্রমণ-কালে ত্যাগ করেছি। যা দুঃখ ও সমস্যা বর্দ্ধক, যা সংসার বর্দ্ধক, আর যা আমার নয় তার অধিকার দেওয়া আমার পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। বোধিবৃক্ষের ছায়াতলে মার-বিজয়ের পর হৃদয় শান্তকর যে সাত প্রকার আর্য-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছি, ঐ লোকোত্তর সম্পত্তিই বুদ্ধগণের পৈতৃক-সম্পত্তি। ঐ সম্পত্তিই রাহুলের হিতকারী, সুখকারী ও প্রকৃত পৈতৃক সম্পত্তি। তাকে ঐ সম্পত্তির অধিকারী করাই আমার একান্ত কর্তব্য।'

রাহুলের অতি আসন্ন ও দূরগামী হিতের কথা চিন্তে করে বুদ্ধ তাঁর ধর্ম-সেনাপতি অগ্রশ্রাবক শারীপুত্রকে আদেশ দিয়ে বলেন-

"আয়ুষ্মান শারীপুত্র, রাহুলকে প্রব্রজ্যা দাও।"

শারীপুত্র চিন্তে করলেন এ অবধি যারা বুদ্ধ-সান্নিধ্যে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভে ধন্য হয়েছেন তাঁরা সবাই বয়স্ক ছিলেন। সাত বছরের কচিকাঁচা বয়সের আর কেহ এ অবধি সংঘভুক্ত হয় নি। তদুপরি কেহ কেবলমাত্র প্রব্রজ্যা-দীক্ষায় দীক্ষিত হয় নি বা কাউকে দীক্ষা দেওয়া হয় নি। একারণে রাহুলকে প্রব্রজ্যাদানের আদেশের প্রত্যুত্তরে শারীপুত্র বুদ্ধের কাছ হতে 'কোন্ বিধিতে রাহুলকে প্রব্রজ্যা দেওয়া হবে' **(কথাহং ভন্তে, রাহুলং কুমারং পব্বাজেমীতি?)** জানতে চান। তখন ন্যাগ্রোধারামে শারীপুত্র প্রমুখ অবস্থানকারী ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে শাস্তা ত্রিশরণ-গমনের বিধিতে রাহুলকে প্রব্রজ্যা দানের আজ্ঞা দেন। সাথে প্রব্রজ্যাদানের প্রাথমিক কর্তব্যেরও উল্লেখ করেন।

অথ খো ভগবা এতস্মিং নিদানে এতস্মিং পকরণে ধম্মিং কথং কত্বা ভিক্খু আমন্তেসি। অনুজানামি, ভিক্খবে, তীহি সরণ- গমনেহি সামণের-পব্বজ্জং।

মহাবগ্গ/ বিনয় পিটক

তাঁর উল্লিখিত বিধিমতে প্রব্রজ্যাপ্রার্থীর ত্রিশরণ-গমনের পূর্বে তাকে দিয়ে নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রাথমিক কর্তব্য সারিয়ে নিতে হবে।

(১) প্রথমত মাথা মুড়িয়ে আর দাড়ি কামিয়ে (সাথে হাত ও পায়ের নখাদিও কাটিয়ে ফেলাতে হবে।

(২) স্নানাদির পর ডান কাঁধ খোলা রেখে বাম কাঁধে কষায় (গৈরিক) চীবর রেখে সুন্দর ভাবে গা ঢাকতে হবে।

(৩) উপস্থিত ভিক্খু বা ভিক্খু-সঙ্ঘের পায়ে মাথা নুইয়ে তাদের চরণ বন্দনা করাতে হবে।

(৪) পায়ের পাতার অগ্রভাগে (আঙ্গুলের) ভর করে প্রব্রজ্যা- প্রার্থীকে (উৎকুটিক মুদ্রায়) বসাতে হবে।

(৫) দু'হাত জোড় করিয়ে বসাতে হবে।

(৬) এর পর প্রব্রজ্যাপ্রার্থীকে এরূপ বল বলতে হবে।

"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।।

দুতিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
দুতিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
দুতিয়ম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।।

ততিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ততিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
ততিয়ম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।।"

মানুষ কখন চিন্তন-অনুচিন্তনের মাধ্যমে কেবল (১) মানসিক কর্ম সম্পাদন করে। আবার কখন মানসিক কর্মের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শব্দোচ্চারণ করে। একে (২) বাচসিক কর্ম বলা হয়। আবার কখনও সে মানসিক কর্মের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শরীর ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন মুদ্রায় সঞ্চালন করে । একে (৩) কায়িক কর্ম বলা হয়। আবার কখন সে তার মানসিক কর্মের সাথে সামঞ্জস্য রেখে (৪) এক সাথে বাচসিক ও কায়িক কর্ম উভয়ই সম্পাদন করে থাকে। উপরোক্ত চার প্রকারের কর্মের মধ্যে শেষোক্ত কর্মটি অধিক ও দীর্ঘস্থায়ী ফলদায়ক হয়ে থাকে।

শাস্তার সদ্য নির্ধারিত 'ত্রিশরণ-গমন প্রব্রজ্যাবিধি'র প্রথম পাঁচটি (১ - ৫) অঙ্গপূরক কর্ম প্রব্রজ্যা-প্রার্থীর কায়িক কর্ম। এসবের মাধ্যমে কায়িক কর্ম সম্পাদিত হলেও এই কায়িক কর্মের মূল উদ্দেশ্য তাতে সূচিত হয় না।

এ নতুন প্রজ্ঞপ্ত প্রব্রজ্যাবিধির ষষ্ঠ বিধি অর্থাৎ কেবল শরণ-গমনের সংকল্পের একবার শব্দোচ্চারণ করার মাধ্যমে আবৃত্তিকারীর দৃঢ় সংকল্প সূচিত হয় না। একারণে শাস্তা তিনবার ত্রিশরণ-গমনের সংকল্প আবৃত্তির বিধান দিয়েছেন।

এভাবে তিনবার ত্রিশরণ-গমনের সংকল্প আবৃত্তির মাধ্যমে প্রব্রজ্যা-প্রার্থীর দৃঢ়তা ও তার বাচনিক কর্মের মূল উদ্দেশ্য প্রকটিত হলেও প্রব্রজ্যিত জীবন বরণে তার আস্থা ও ত্যাগ প্রকটিত হয় না।

প্রব্রজ্যিত জীবন বরণে প্রব্রজ্যাপ্রার্থীর যে গভীর আস্থা রয়েছে এবং এ জীবনযাপনের জন্যে সে যে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে তার সামান্য প্রমাণ স্বরূপ কায়িক কর্মসমূহের (১-৫) সম্পাদনের বিধান দেওয়া হয়েছে। এর সাথে বাচনিক কর্ম (৬) সম্পাদনের

বিধানও সংযোজিত হওয়ায় তা একেবারে সোনায় সোহাগা হয়েছে। এবিধি প্রব্রজ্যাপ্রার্থীর জীবনে এক গভীরতর মনোবৈজ্ঞানিক ছাপ ফেলে।

ত্রিশরণ-গমনের সুপরিণামের বর্ণনা ত্রিপিটক-এর পাতায় পাতায় নানা প্রসঙ্গে ভুড়ি ভুড়ি রয়েছে। গ্রন্থ-কলেবর বিস্তারিত হবে আশঙ্কায় এখানে কেবল একটি প্রসঙ্গেরই চর্চা করা হল।

কোশলরাজ প্রসেনজিতের এক পুরোহিতের নাম ছিল অগ্নিদত্ত। ঐ পুরোহিত তাঁর বার্দ্ধক্য অবস্থায় সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষা নেন। গৃহী জীবনে রাজপুরোহিত থাকার সুবাদে অচিরেই তিনি আশাতীত নাম ও যশের অধিকারী হয়ে পড়েন। তার শিষ্য সংখ্যাও প্রচুর হয়। তিনি তার শোকগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত ও বিবিধ ভয়ে ভীত-ত্রস্ত অনুগামীদের পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, গাছ-গাছালি, জল-জলাশয়, গ্রহ-নক্ষত্রাদির শরণে গিয়ে আত্মসমর্পণপূর্বক পূজা-প্রার্থনা করার পরামর্শ দিতেন। আর বলতেন এতেই মুক্তি। মুক্তি লাভের আর অন্য কোন উপায় নেই।

মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ প্রতিদিনের ন্যায় একদিন ভোর সকালে ধ্যানস্থ হয়ে 'আজ কার মহান উপকার করতে পারবেন'- জানার উদ্দেশ্যে দিব্যদৃষ্টিজাল বিস্তার করেন। দিব্য-দৃষ্টিতে ঐ পুরোহিত সন্ন্যাসীর অতীতের জন্মার্জিত পুণ্যকর্মের সুফল হেতু ও অরহত্ব প্রাপ্তির কাল অতি সন্নিকট জেনে তিনি নিজেই জেতবন হতে সোজা তার আশ্রমে যান। কথাপ্রসঙ্গে শাস্তা তাকে অন্য শরণ-গমন অপেক্ষা ত্রিশরণ-গমনের মাহাত্ম্য-কথা বর্ণনা করে নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করেন--

বহুং বে সরণং যন্তি পব্বতানি বনানি চ
আরামরুক্খচেত্যানি মনুস্সা ভয়তজ্জিতা।

নেতং খো সরণং খেমং নেতং সরণমুত্তমং
নেতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্খা পমুচ্চতি।

যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো।
চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মপ্পঞ্ঞায় পস্সতি।
দুক্খং দুক্খ-সমুপ্পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং
অরিয়ঞ্চট্ঠঙ্গিকং মগ্গং দুক্খূপসমগামিনং।
এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং
এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্খা পমুচ্চতি।

১৮৮ - ১৯২ গাথা ধম্মপদ

অর্থাৎ বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, উদ্যান, চৈত্যাদির শরণ উত্তম শরণ নয়। এতে সাময়িক সুরক্ষা পেলেও শরণার্থী পূর্ণত ভয় ও সমস্যা হতে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন ব্যক্তি প্রজ্ঞা চক্ষুতে দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধ-গামিনী প্রতিপদা এ চার আর্য সত্য প্রত্যক্ষ অনুভব করে এবং সাথে বিবিধ দুঃখ ও সমস্যা হতে নিজেকে নিঃসন্দেহে চিরতরে মুক্ত করাতে পারে। একারণে ত্রিশরণ-গমনই সর্বশ্রেষ্ঠ শরণ।

বৌদ্ধ সংঘ ও বৌদ্ধ সমাজ সৃষ্টির মূলে ও এদের সুসংগঠিত রূপদানে ত্রিশরণ-গমন প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ক্রমান্বয়ে এ প্রক্রিয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ নেয়। প্রতিটি বৌদ্ধ পরিবারে ও বিহারে অন্তত সকাল সন্ধ্যায় দুবার ভক্তি সহকারে সমবেতভাবে ত্রিশরণ উচ্চারণ করে তথাগত বুদ্ধের শিষ্যগণ নিজেদের শ্রদ্ধার উৎকর্ষ সাধন করেন।

এভাবে উৎকর্ষিত শ্রদ্ধা যুক্ত চিত্তে সম্পাদিত কুশল (পুণ্য) কর্মে কর্ম-সম্পাদকের ভাবী জীবনের সুখ, শান্তি ও সুফল প্রাপ্তির বীজ নিহিত

থাকে। একারণে তথাগত বুদ্ধ শ্রদ্ধাকে বীজ এবং কর্ম সম্পাদনের প্রয়াসকে বৃষ্টি রূপে (**সদ্ধা বীজং তপো বুট্ঠি**) বর্ণনা করেছেন। এ শ্রদ্ধার ভিত্তিতে ব্যক্তি কোন প্রকারের ভৌতিক সাধন ছাড়াই গঙ্গা, যমুনা আর ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় ভীষণ বেগবতী নদীর স্রোতও উত্তরণে সমর্থ হয়। একারণে শাস্তাকে অনেক ক্ষেত্রে **'সদ্ধায় তরতি ওঘং'** কথা বলতে পাই। বিবিধ কুশল কর্মের সম্পাদনে অত্যাবশ্যক পূরক অঙ্গরূপে যুক্ত থাকায় তথাগত বুদ্ধ এ শ্রদ্ধাকে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনরূপেও (**সদ্ধা পুরিসস্স সেট্ঠং ধনং**) ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিই এ সংসারে প্রকৃতপক্ষে হীন ও নিঃস্ব।

এসব কারণেই বৌদ্ধ ধর্মের পরবর্তী পর্যায়ে 'ত্রিশরণ-গমন' অনুষ্ঠানটিকে বৌদ্ধ পরিবারের শোকানুষ্ঠানে শোক-অপনোদনে, আনন্দানুষ্ঠানে আনন্দবর্দ্ধনে এবং তপ-ত্যাগ-তিতিক্ষাময় অনাগারিক জীবন-যাপনে ইচ্ছুক ব্যক্তির দীক্ষা দানাদি অনুষ্ঠানের কেবলমাত্র অভিন্ন অঙ্গরূপেই নয়, একে আদি ও মুখ্য কর্মের মর্যাদাও দেওয়া হয়েছে। আরও পরবর্ত্তী পর্যায়ে এ ত্রিশরণ-গমন বীজমন্ত্ররূপেও প্রযুক্ত হতে পাওয়া যায়।

ত্রিশরণ-গমনকে কোন প্রকারেই এক অসহায় দুর্বল অন্ধের আত্মসমর্পণ বলা যায় না। এ শরণ-গমনকে আত্মবলে বলীয়ান এক সদা জাগ্রত, চতুর ও কর্তব্যপরায়ণ প্রহরীর কর্তব্য পালনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ঐ শরণ-গমন প্রকারান্তরে আত্মশরণ-গমনের নামান্তর মাত্র। তথাগত বুদ্ধের ভাষায় আত্মশরণই সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য শরণ।

মানব-সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে আত্মশরণ-গমন বা ত্রিশরণ-গমন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কোন শরণের আবিষ্কার আজ অবধি হয় নি।

ভবিষ্যতেও যে হবে না, তা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে।

এমন শরণ-গমন ব্যতীত কেহ তথাগত বুদ্ধের আদি, মধ্য ও অন্ত কল্যাণকারী ধর্মের মর্মোদ্ধার ও রসাস্বাদন করতে পারে না।

শাস্তা কর্তৃক প্রজ্ঞপ্ত বিধিতে শারীপুত্রের মাধ্যমে রাহুলের প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংবাদে মহারাজ শুদ্ধোদন যারপরনাই শোকগ্রস্ত হন। এ ধরনের হৃদয়-বিদারক শোকে যাতে অন্য মাতা-পিতা ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, দাদু-দিদিমারা যেন তাঁর মতো মর্মান্তিক শোকগ্রস্ত না হন, সে কথা চিন্তা করে সাথে সাথে নিজের শোকমাত্রার ভার সংবরণ করে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হন। অভিবাদনান্তে অত্যন্ত নম্র স্বরে তিনি এক নিবেদন জানিয়ে বলেন –

"ভন্তে, আপনার প্রব্রজ্যায় অনেক দুঃখ পেয়েছিলাম। নন্দের প্রব্রজ্যা বা দীক্ষা গ্রহণের সংবাদে তার চেয়ে কোন অংশে কম দুঃখ পাই নি। কিন্তু আদরের নাতি রাহুলের প্রব্রজ্যায় যে দুঃখ পেয়েছি তা অসহনীয়।

পুত্রস্নেহজনিত দুঃখ, ভন্তে, ত্বককে ছেদ করে, ত্বক ছেদ করার পর চামড়া ছেদ করে, মাংস ছেদ করে, স্নায়ু ছেদ করে, অস্থি ছেদ করে, অস্থি ছেদ করার পর তা অস্থি-মজ্জায় অবস্থান করে।

ভন্তে, মা-বাবার অনুমতি না নিয়ে তাদের সন্তানকে প্রব্রজ্যা-ধর্মে দীক্ষা না দেবার বিধান দিলে খুবই ভাল হয়।"

শাস্তা পিতার এ অনুরোধ তৎক্ষণাৎ মেনে নেন। পিতাকে ধর্মোপদেশ দানের মাধ্যমে সান্ত্বনা দিয়ে ধর্মজীবন যাপনের প্রেরণা দেন। মহারাজ শোকমুক্ত হয়ে শাস্তাকে অভিবাদন জানানোর পর প্রদক্ষিণ করে রাজপ্রাসাদে ফিরে যান। মহারাজার প্রস্থানের পর শাস্তা ভিক্ষু-সংঘকে

আহ্বান করে আদেশ দেন---

"মাতা-পিতার (বা অভিভাবকের) অনুমতি বিনা তাদের সন্তানকে প্রব্রজ্যা (ধর্মে দীক্ষা দান) দেবে না। অনুমতি না নিয়ে প্রব্রজ্যা দেওয়া হলে প্রব্রজ্যাদানকারী ভিক্ষু বিনয়-বিরোধী দুস্কৃত কর্মে দোষগ্রস্ত হবে।"

পরদিন ভগবান রাজপ্রাসাদে অন্নগ্রহণের পর একান্তে আসন গ্রহণ করলে রাজা শুদ্ধোদন পাশে এসে বসেন, আর বলেন- 'ভন্তে, আপনি যখন দুষ্কর কৃচ্ছসাধনে রত ছিলেন, তখন কোন এক দেবতা আমার কাছে এসে জানিয়েছিল- 'মহারাজ, আপনার পুত্র মারা গেছেন'।'

দেবতার ঐ কথায় বিচলিত না হয়ে প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলাম 'সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর মৃত্যু হতেই পারে না।'

একথা শুনে শাস্তা বলেন--- 'এ ধরণের আস্থা শুধু এবারই নয়, অতীতেও ছিল।' অতীতেও কিছু দেবতা নকল অস্থি দেখিয়ে আপনাকে বলেছিল- 'এ দেখুন, আপনার মৃত-পুত্রের অস্থি-কঙ্কাল।' এমত পরিস্থিতিতেও আপনি তাদের কথায় মোটেই গুরুত্ব দেন নি। পূর্বে যখন তারা আমার প্রতি আপনার আস্থায় ভাঙ্গন ধরাতে পারে নি, এবার কি করে তা সম্ভব হবে? এ প্রসঙ্গে অতীত কথার বিস্তারকালে শাস্তা তাঁকে মহাধর্মপাল-জাতক শুনিয়েছিলেন। এ জাতক-কথা শোনার সময় মহারাজা ঐ আসনেই অনাগামী-ফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

এভাবে পিতাকে তিন প্রকার আর্যফলে প্রতিষ্ঠিত করেন আনন্দ, ভদ্রিয়, অনুরুদ্ধ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত প্রমুখ অগণিত শাক্যকুল-পুত্রগণকে ভিক্ষু-ধর্মে দীক্ষা দিয়ে এবং অগণিত শাক্যের হৃদয়ে সদ্ধর্মে শ্রদ্ধোৎপাদনের হেতু তৈরী করে শাস্তা সশিষ্য রাজগৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

রাজগৃহে আসার পথে শিশু রাহুলও বুদ্ধ-প্রমুখ বিশাল ভিক্ষু-সংঘের সাথে তার ছোট পায়ে হেঁটে হেঁটে নালন্দায় পৌঁছান। সাময়িক বিশ্রামগ্রহণের পর নালন্দা হতে রাজগৃহের পথে বেণুবনের অবিদূরে অবস্থিত 'অম্বলট্ঠিকা'য় (ভবনে) অবস্থান করেন। এটি অতীব একান্তে অবস্থিত হওয়ায় সাধক ভিক্ষুগণ অধিকাংশই এখানে ধ্যানাভ্যাস করতে পছন্দ করতেন। এখানে অবস্থানকালে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কয়েকটি উপদেশ দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে রাহুলোবাদ-সূত্রটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এ সূত্রটি অম্বলট্ঠিকা রাহুলোবাদ-সূত্র নামেও পরিচিত। এ সূত্রে শ্রামণ্যজীবনে মিথ্যে বলার দুষ্পরিণামসূচক জটিল তত্ত্বকথাকে সরল হতে সরলতর একাধিক উপমা দানের মাধ্যমে সাত বছরের শিশু রাহুলের বোধগম্য করার প্রয়াসে শাস্তাকে প্রয়াসশীল দেখতে পাই।

ঐ সময় অনাথপিণ্ডিক নামে অতি সুপরিচিত এক শ্রাবস্তী-বাসী শ্রেষ্ঠী নিজ ব্যবসা উপলক্ষে পণ্যসামগ্রীতে ভরা শত গরুগাড়ী নিয়ে রাজগৃহে এসেছিলেন। রাজগৃহে এসে পূর্বাচরিত নিয়মানুসারে এবারও তিনি তার এক অতি নিকট বন্ধুর বাড়ীতে উঠেছিলেন। সৌভাগ্যবশত সে বন্ধু এর মধ্যে বুদ্ধ-সান্নিধ্যে এসে বুদ্ধের উপাসকত্ব বরণ করেন। বন্ধুর মুখে বুদ্ধের বিবিধ অসাধারণ গুণকথা শুনে তার হৃদয়েও বুদ্ধ-দর্শনের তীব্র অভিলাষা জন্মে। একদিন সকালে অপ্রত্যাশিত-ভাবে তিনি শাস্তার দর্শনলাভে সমর্থ হন। শাস্তার অমৃতঝরা বাণী শুনে তিনি স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হন। পরদিন তিনি বুদ্ধপ্রমুখ সংঘকে মহাদান দেন। বুদ্ধকে সশিষ্য শ্রাবস্তী-নগরে যাবার আমন্ত্রণ জানান। বুদ্ধ শ্রাবস্তী-গমনের স্বীকৃতি দেন। স্বীকৃতি পেয়ে শ্রেষ্ঠী অভিবাদন জানিয়ে শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

রাজগৃহ হতে শ্রাবস্তী ফেরার পথে প্রতি যোজন দূরত্বে শাস্তার

বিশ্রামার্থে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে এক বিহার নির্মাণ করান। শ্রাবস্তী পৌঁছে অনতিবিলম্বে জেতকুমারের শর্তানুসারে আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রা বিছিয়ে তার পরিবর্তে একটি উদ্যান (বন) ক্রয় করেন। বনভূমির সংস্কার সাধন করে ওর ঠিক মাঝখানে শাস্তার মনোনুকুল গন্ধকুটি বিহার তৈরী করান। এর চারপাশে শাস্তার আশীজন শ্রাবকের যোগ্য সব সুবিধাযুক্ত আশীটি কুটিরও তৈরী করান। এরপর শ্রেষ্ঠী শাস্তাকে শ্রাবস্তী-নগরে নিয়ে আসার জন্যে একজন বিশেষ দূতকে রাজগৃহে পাঠান। দূতের মুখে শ্রেষ্ঠীর পুন আমন্ত্রণ পেয়ে শাস্তা বিশাল ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভ করেন।

নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে তাঁরা শ্রাবস্তী নগরে পৌঁছান। শ্রেষ্ঠী সসম্মানে শোভাযাত্রা সহকারে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে আগু বাড়িয়ে জেতবন বিহারে নিয়ে আসেন। আচার্য বুদ্ধঘোষ রচিত জাতকার্থকথার নিদানে ঐ শোভাযাত্রার বিচিত্র বর্ণনা রয়েছে। শাস্তাও বিবিধ বুদ্ধলীলা প্রদর্শন করে জেতবন বিহারে প্রবেশ করেন।

জেতবন বিহারের সামনে মহাউপাসিকা বিশাখা পূর্বারাম নামে আর একটি বিহার তৈরী করিয়ে বুদ্ধ প্রমুখ আগত-অনাগত ভিক্ষু-সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দান করেন। এ উপলক্ষে বিশাখাও এক মহাদানোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। তবে এ দানোৎসব চলেছিল মাত্র চার মাস, আর শ্রেষ্ঠীর আয়োজিত দানোৎসব চলেছিল নয় মাস। এভাবে জেতবন ক্রয়ে, বিহার নির্মাণে ও সমারোহের আয়োজনে তার সব মিলে চুয়ান্ন কোটি সোনার মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল।

ঐবার জেতবন বিহারে অবস্থানকালে শারীপুত্র মহাস্থবিরের এক সেবক তার এক ছেলেকে মহাস্থবিরের কাছে পাঠিয়ে অনুরোধ করেন যাতে (তিনি) ঐ ছেলেকে প্রব্রজ্যা-ধর্মে দীক্ষা দেন। ঐ সময়ে শাস্তার

আদেশে সঙ্ঘে এক ভিক্ষুর মাধ্যমে কেবল এক শ্রামণের দীক্ষা দানের বিধি প্রচলিত ছিল। শারীপুত্র চিন্তে করলেন 'আমি ইতিপূর্বে রাহুলকে দীক্ষা দিয়েছি। একাধিক শ্রামণেরের দীক্ষার বিধান শাস্তা কর্তৃক প্রজ্ঞপ্ত হয় নি। এখন আমার পক্ষে কি করা কর্তব্য? শারীপুত্র তা শাস্তার গোচরীভূত করান। এ প্রসঙ্গে শাস্তা ভিক্ষু-সঙ্ঘের এক সভা আহ্বান করেন। ঐ সভায় তিনি আদেশ দেন, যোগ্য ও সমর্থ ভিক্ষু দু'জন শ্রামণেরের দীক্ষা দিতে পারবেন। প্রয়োজনে সে যতজন শ্রামণেরকে অনুশাসন করতে পারবে বলে মনে করে ততজনকেও দীক্ষা দিতে পারবে'। অনুমতি পেয়ে শারীপুত্র ঐ বালককেও শ্রামণের রূপে দীক্ষা দেন।

২। দসসিক্খাপদানি

একদিন নবপ্রব্রজ্যিত শ্রামণের ও রাহুল শ্রামণেরের মধ্যে প্রব্রজ্যিতদের করণীয় বা পালনীয় ধর্ম সম্পর্কে চর্চা চলে। ব্যাপারটি শাস্তার গোচরীভূত করা হয়। ঐ প্রসঙ্গে শাস্তা শ্রামণেরগণের পালনীয় বা অনুশীলনীয় দশ-শিক্ষাপদের বিধান দেন।

"অনুজানামি, ভিক্খবে সামণেরানং ইমানি দস সিক্খাপদানি। ইমেসু চ সামনেরেহি সিক্খিতুং।"

খুদ্দকপাঠ/ অট্ঠকথা

এ দশটি শিক্ষাপদের মূল পালিপদ বর্ণনা ক্ষুদ্রকপাঠের দ্বিতীয় পাঠে দেওয়া হয়েছে। পরমার্থ সিদ্ধি বা পরমসুখময় নির্বাণপদ প্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তি এবং বিশেষ করে আগারিক জীবন প্রকৃষ্টরূপে বর্জন করে অনাগারিক জীবনযাপনে ব্রতী প্রব্যজিতদের পক্ষে এ শিক্ষাপদ-

গুলোর পালন করা পরম কর্তব্য। প্রজ্ঞা-চক্ষুর উন্মেষণ বিনা আর্য ও পরমার্থ সত্যের অধিকারী হওয়া কাহারও পক্ষে কখন সম্ভব নয়। প্রজ্ঞা-চক্ষুর উন্মেষণের জন্যে প্রয়োজন পরিশুদ্ধ ও সমাধিস্থ মানসিক কর্মের। আবার প্রদুষ্ট মানসিক প্রবৃত্তি ও তজ্জনিত প্রদুষ্ট মানসিক কর্মের বর্জন বা বিনাশ সাধন ব্যতীত পরিশুদ্ধ মানসিক প্রবৃত্তি ও তজ্জনিত পরিশুদ্ধ মানসিক কর্মের উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়। পুনরায় এর উৎকর্ষ সাধনের জন্যে প্রয়োজন হয় সুসংযমিত কায়িক ও বাচসিক কর্ম সম্পাদনের। আর এর জন্যে প্রয়োজন হয় বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞপ্ত শিক্ষাপদ (শীল) অনুশীলনের। মানবের জীবনে করণীয় বা পালনীয় সব কুশল কর্মের মধ্যে শীল-পালন-জনিত কর্ম আদি কুশল কর্ম। শীল-পালন ব্যতীত অন্য উত্তরোত্তর কুশল-কর্ম সম্পাদন কখন সম্ভব নয়।

জীবন-মানভেদে অনুশীলনীয় শীলের প্রভেদ আসা স্বাভাবিক। দৃষ্টি ও সংস্কার ভেদে মানব সমাজের প্রতিটি মানবেরই নিজস্ব জীবন-মান রয়েছে। এ দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানবই একে অপর হতে ভিন্ন। তা হলেও মানবের জীবন-মান ও জীবনযাপনশৈলীকে আগারিক ও অনাগারিক জীবন ভেদে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

আগারিক মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবনকে যাতে ক্রমান্বয়ে আধ্যাত্মিক পরমার্থ প্রাপ্তির পথে সুনিয়োজিত ও সার্থক করে তুলতে সমর্থ হয় তজ্জন্য তথাগত বুদ্ধ পাঁচটি শিক্ষাপদের (শীল) বিধান দিয়েছেন। পালি ভাষা ও সাহিত্যে বর্ণিত তাঁর নির্দ্ধারিত পাঁচটি শিক্ষাপদ (পালি ভাষায়) এরূপ:-

(১) পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(২) অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(৩) কামেসুমিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(৪) মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(৫) সুরামেরেয়মজ্জপ্পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

উপরোক্ত শিক্ষাপদগুলিকে একত্রে পঞ্চশীল বলা হয়। এসবের বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া হল।

(১) প্রাণীহত্যাজনিত কর্ম হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ পালন করার সংকল্প গ্রহণ করলাম।

(২) অপ্রদত্ত বস্তু গ্রহণ বা চৌর্য কর্ম হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ পালন করার সংকল্প গ্রহণ করলাম।

(৩) নিজের স্ত্রী ব্যতীত পরস্ত্রী বা অপর নারীকে মাতৃজ্ঞানে মিথ্যা-কামাচারজনিত কুকর্ম হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ পালন করার সংকল্প গ্রহণ করলাম।

(৪) মিথ্যা (অসত্য ও ভেদ মূলক) বাক্য প্রয়োগজনিত পাপ (নিন্দনীয়) কর্ম হতে বিরত থাকার সংকল্প গ্রহণ করলাম।

(৫) ধন, জন, মান, জ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিনাশকারী সুরা মদ্যাদি বা যে কোন প্রকারের দ্রব্য গ্রহণ বা প্রমত্তকর স্থান গমন জনিত কর্ম হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ পালন করার সংকল্প গ্রহণ করলাম।

এ পাঁচটি শীলের অনুশীলন ব্যতীত কোন ব্যক্তিই তার ব্যক্তিগত,

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ সবে প্রতিষ্ঠিত হলেই মুমুক্ষু প্রাণীর জীবনে আধ্যাত্মিক মার্গের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হয়।

পঞ্চশীলের অনুশীলনে দক্ষ কিছু আগারিকজন শ্রদ্ধাধিক্য হেতু অনাগারিক জীবনেই আধ্যাত্মিক পথ প্রশস্ত করতে চান। এমন অনাগারিকজনের সুবিধার্থে তথাগত বুদ্ধের শাসনে নিম্নলিখিত আটটি শীল (**অট্ঠসীল**) পালনেরও বিধি রয়েছে:-

(১) পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(২) অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(৩) অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(৪) মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(৫) সুরামেরেয়মজ্জপ্পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(৬) বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(৭) নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদস্সনা মালাগন্ধ-বিলেপনা ধারণ-মণ্ডণ বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(৮) উচ্চসয়না মহাসয়না বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

এ আটটির মধ্যে চারটি (১, ২, ৪, ৫) শিক্ষাপদের অর্থ পঞ্চশীলের (বাংলা) অনুবাদ দানকালে প্রদত্ত হয়েছে। এ চারটির অতিরিক্ত অন্য চারটি (৩, ৬, ৭ ও ৮) শিক্ষাপদের অনুবাদ নীচে দেওয়া হল।

(৩) ব্রহ্মচর্য জীবনের বাধক (নিজ স্ত্রী, পরস্ত্রী, নিজ স্বামী ও

পরপুরুষ) ও অন্য নারীর বা পুরুষের সাথে সহবাসজনিত আচরণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ পালন করার সংকল্প গ্রহণ করলাম।

(৬) (মধ্যাহ্নে অন্নগ্রহণের পর) বিকালে (অপরাহ্নে বা রাত্রে অনাবশ্যক) অন্নগ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ পালনের সংকল্প গ্রহণ করলাম।

(৭) নাচ-গান করা, বাদ্য-যন্ত্র বাজানো ও এসব ধরনের কাজে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শনমূলক কর্ম হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ পালনের সংকল্প গ্রহণ করলাম।

(৮) অতি উঁচু ও আরামদায়ক মূল্যবান শয়নাসনের গ্রহণ ও প্রয়োগজনিত কর্ম হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ পালনের সংকল্প গ্রহণ করলাম।

শ্রামণের বা নব-প্রব্রজ্যিতদের পালনীয় দশশিক্ষাপদের অষ্টমটি হল- (৮) **মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূষণট্ঠানা বেরমণীসিক্খাপদং সমাদিয়ামি'**। এটি উপরোক্ত **'অট্ঠঙ্গ উপোসথ'** শীলের অংশ-বিশেষ। (৯) নবম শিক্ষাপদটি হল --- **উচ্চসয়না মহাসয়না বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি**। আর (১০) দশমটি হল - **জাত-রূপ-রজত-পটিগ্গহণা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি**। এই শেষ শীলটি অট্ঠঙ্গ উপোসথ-সীল হতে ভিন্ন।

শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকাগণ তাদের দৈনন্দিন সাংসারিক ও জীবিকার্জনের কর্ম-ব্যস্ত জীবন হতে সাময়িক বিরতি বা অবকাশ নিয়ে শারীরিক ক্লান্তি, মানসিক দুশ্চিন্তা দূরীকরণ ও মানসিক শান্তি পাবার উদ্দেশ্যে এ আটটি শীল পালন করতে পারেন। তবে সাধারণত গৃহীজন কৃষ্ণ বা শুক্ল পক্ষের অষ্টমী, চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমাদি উপোসথ দিবসে বিহারে অবস্থান করে আটটি শীল পালন

করে থাকেন। একারণে এ আটটি শীলকে অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল (**অট্‌ঠাঙ্গ উপোসথসীল**)ও বলা হয়। বুদ্ধ নির্দেশিত অনাগারিক জীবনযাপনে ব্রতী শিষ্যদের শ্রামণের, শ্রামণেরী, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এ চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

এ চার শ্রেণীর মধ্যে শ্রামণের রাহুলের প্রব্রজ্যা-ধর্মে দীক্ষা প্রাপ্তির কাল অবধি কেহ ভিক্ষুণী ও শ্রামণেরী রূপে দীক্ষা নেয় নি। এ কারণে তাদের জীবন সঞ্চালনের পথ প্রদর্শনের কোন প্রশ্নই তখনও উঠে নি। অগণিত শ্রদ্ধালুজন ঐ এক দেড় বছরের মধ্যে বুদ্ধ-সান্নিধ্যে এসে আর্য-মার্গ-ফলাদিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উপাসক-উপাসিকারূপে শিষ্যত্ব গ্রহণের, তাদের অনুশীলনীয় উপরোক্ত পঞ্চশীল ও অষ্টশীলের বিধান তখনও শাস্তা কর্তৃক প্রজ্ঞপ্ত হয় নি। এ সবের প্রজ্ঞপ্ত হওয়ার কথা দুরে থাকুক, তাঁর ভিক্ষু-শিষ্যদের অধিকাংশই অরহত্ব-ফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁদের পালনীয় বিনয়ের বিধি-বিধান প্রজ্ঞাপনের বিশেষ প্রয়োজন' তখনও দেখা দেয় নি।

ত্রিশরণ-গ্রহণে ও দশ শিক্ষাপদের অনুশীলনে শ্রামণেরগণের কায়িক ও বাচসিক কর্ম বশীভূত হলেও মানসিক কর্ম তাঁদের বশীভূত হয় নি। তাঁদের মনে সময়ে অসময়ে নানা ধরণের জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ উঁকি মারে। মন প্রদূষিত হয়। চিত্ত- চাঞ্চল্যতা দেখা দেয়।

অনুপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অকালে ও অযাচিত ভাবে উপদেশ দানের দুষ্পরিণাম সম্পর্কে অবহিত থাকায়, বুদ্ধগণ সত্যার্থী সন্ধানী শ্রোতার উপযুক্ত মন-মানসিকতার উৎকর্ষসাধনের প্রতীক্ষায় থাকেন। এ কারণে শ্রামণেরগণের মানসিক কথা জেনেও বুদ্ধ নীরবে থাকেন।

সে যে কারণেই হউক না কেন অন্যান্য শ্রামণেরগণের তুলনায় রাহুলের মনেই অধিক জিজ্ঞাসা ছিল। কখনও এ জিজ্ঞাসা, কখনও ও জিজ্ঞাসা।

৩। দ্বাত্তিংসাকার

বয়সে ছোট হলেও রাহুল একেবারে অবোধ ছিল না। পূর্ব পূর্ব জন্মের অসীম পুণ্যের প্রভাবে এ জন্মে বুদ্ধের ঔরসজাত পুত্র ও বুদ্ধের অগ্রশাবক এবং প্রধান ধর্ম-সেনাপতির শিষ্য হবার সৌভাগ্য সে পেয়েছিল। দীক্ষা লাভের পর হতেই এদের নিকট সান্নিধ্য ও স্নেহ পেয়ে সে কখনও নিজেকে একাকী বোধ করে নি। স্নানাহার ও তন্দ্রা-নিদ্রায় ব্যয়িত সময়টুকু বাদ দিয়ে অবশেষ সময়ের অধিকাংশ এদের এবং অন্যান্য ভিক্ষুগণের আহার-বিহার গমনাগমন আচার-আচরণ খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতেন। এসব ব্যাপারে এরা সামান্য জন হতে ভিন্ন কেন? প্রাতে, অপরাহ্নে বা রাত্রে শূন্যাগারে এবং শূন্যাকাশের তলে, কখনও বা একান্তে কোন এক গাছের নীচে বা গহনারণ্যে গুরুজনগণকে পদ্মাসন বা অর্দ্ধ পদ্মাসনাদি ধ্যানমুদ্রায় বসে থাকতে দেখে এভাবে বসে 'এরা কি করছে?' জানার ইচ্ছে তাঁকে ব্যাকুল করে তুলতো। আগ্রহাতিশয্যে তিনি কখনও কখনও তাঁদের মুদ্রার নকল করে ধ্যানস্থ হবার প্রয়াস করতেন।

একবার জেতবন বিহারে অবস্থানকালে ভগবান বুদ্ধ পূর্বাহ্ন সময়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে শ্রাবস্তীর অলি-গলিতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বেরিয়েছিলেন। শ্রমণ রাহুলও ভিক্ষাপাত্র হাতে তাঁর অনুগমন করতে থাকেন। হঠাৎ মাঝপথে পেছন ফিরে তাকাতেই ভগবান রাহুলকে দেখেন। রাহুলকে সম্বোধন করে তিনি বলেন- "হে রাহুল, অতীত, অনাগত বা বর্ত্তমান কালের উৎপন্ন আভ্যন্তরীন বা বাহ্য, স্থুল বা সুক্ষ্ম, হীন বা প্রণীত এবং নিকটস্থ বা দুরস্থ রূপ-সমূহের কোনটি নয় আমার, নয় আমি তার, নয় সে আমার আত্মা'। এ ধরণের সম্যক্ দৃষ্টিতে সমস্ত রূপকে (ভৌতিক তত্ত্ব) জানা আবশ্যক। রাহুল জানতে

চান--- 'ভগবান, কেবল কি 'রূপ'কেই এভাবে জানা আবশ্যক, কেবল কি 'রূপ'কেই ?'

ভগবান - হে রাহুল! রূপ-স্কন্ধকেও, বেদনা-স্কন্ধকেও, সংজ্ঞা-স্কন্ধকেও, সংস্কার-স্কন্ধকেও এবং বিজ্ঞান-স্কন্ধকেও (এই একই জ্ঞানে জানা আবশ্যক)।

ভগবান বুদ্ধের মাধ্যমে অনুশাসিত হয়ে রাহুল অত্যন্ত প্রসন্ন হন। 'ভিক্ষান্ন সংগ্রহে আর যাবার কি প্রয়োজন'--- ভেবে তিনি ঐ স্থান হতেই ফিরে এসে এক গাছের নীচে পদ্মাসনে বসে শরীরকে সোজা রেখে স্মৃতি জাগ্রত করে ধ্যানস্থ হয়ে ভগবান বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে স্মৃতি-সাধনা করার প্রয়াসী হন।

কিছুক্ষণ পরে পাশ দিয়ে শারীপুত্র মহাস্থবির যাচ্ছিলেন। রাহুলকে এভাবে ধ্যান-মুদ্রায় বসে থাকতে দেখে তিনি তাঁর দিব্যজ্ঞানে জানতে পারলেন--- কেন রাহুল ঠিক ভাবে বুদ্ধের উপদেশ বুঝতে পারে নি। সাথে এর কারণও জানলেন। এর পর রাহুলকে ডেকে বললেন "হে রাহুল, আনাপান-স্মৃতি-ভাবনা কর। হে রাহুল, আনাপান-স্মৃতি-ভাবনা কর। আনাপান-স্মৃতি-ভাবনার ফল মহান। এ ভাবনার অভ্যাস মহোপকারী।"

সে দিনের সান্ধ্যকালীন বিবেক-বিহার (ধ্যানাসন) হতে উঠে রাহুল সোজা বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হন। অভিবাদনান্তে একান্তে বসে ভগবানের কাছ হতে জানতে চান- "ভগবান, আনাপান-ভাবনা কিভাবে করতে হয়? কিভাবে ভাবিত হলে এ ভাবনা মহান ফলদায়ক ও মহান উপকারী হয়?"

উত্তরে ভগবান এ ভাবনার নিম্নলিখিত ক্রমোত্তর মার্গ-বিষয়ক উপদেশ দেন :--

প্রাণীর ভৌতিক দেহ পাঁচ প্রকারের ধাতুতে তৈরি। এ পাঁচটি ধাতু হল--- (১) পৃথিবী ধাতু, (২) আপ ধাতু, (৩) তেজ ধাতু, (৪) বায়ু ধাতু, ও (৫) আকাশ ধাতু। এদের প্রত্যেকটি আবার আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক ভেদে দু'ভাগে বিভক্ত।

নিজ শরীরে ব্যক্তিগত যা কিছু কর্কশ, কঠিন কর্মজনিত (উপাদান) রূপ যেমন কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থি-মজ্জা, (বক্ষ) বৃক্ক, হৃদয়, যকৃত, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, অন্ত্র, অন্ত্র-বন্ধনী, উদরস্থ খাদ্য, মস্তিষ্ক ও বিষ্ঠা বা অন্য যা কিছূ দৈহিক ও আভ্যন্তরীন ব্যক্তিগত দেহে কর্কশ, কঠিন উপাদি রূপে আছে সব আভ্যন্তরীন 'পৃথিবী ধাতু'। এ আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক পৃথিবী ধাতুই-পৃথিবী ধাতু। 'এ পৃথিবী ধাতু নয় আমার, নয় আমি (তাতে স্থিত) তার, এবং ওটি আমার আত্মাও নয়'- এভাবে একে সম্যক্‌ প্রজ্ঞালোকে যথাস্থিতি জ্ঞানে জানতে হবে।

দেহাভ্যন্তরস্থিত এবং একান্ত ব্যক্তিগত বায়ু ও তদ্‌ জাত উপাদিন্ন (কর্মজ) বায়ু যেমন উর্ধগামী বায়ু এবং আশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রবাহিত বায়ু বা অন্য সব বায়ু আভ্যন্তরীন বায়ু। এ আভ্যন্তরীন বায়ু বা বাহ্যিক বায়ুই 'বায়ু ধাতু'। এ 'বায়ু ধাতু' নয় আমার, নয় আমি (তাতে স্থিত) তার, নয় তা আমার আত্মা। এভাবে এ ধাতুকে সম্যক্‌ প্রজ্ঞালোকে যথাস্থিতি জ্ঞানে জানতে হবে (জানা উচিত)।

এই আনাপান-স্মৃতি-ভাবনার পরবর্তী পর্যায়রূপে তিনি রাহুলকে মাটি (পৃথিবী), জল, আগুন, বাতাসের সমান আচরণ করার অর্থাৎ অসীম সহিষ্ণুতা অর্জন করার অর্থাৎ আকাশের সমান অপ্রতিস্থিত হয়ে থাকার পরামর্শ এভাবে দেন---

এর পরবর্তী পদক্ষেপ রূপে তিনি রাহুলকে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা,

উপেক্ষাময় ব্রহ্মবিহার ভাবনার পরামর্শ দেন।

'রাহুল, (সকলের প্রতি) মৈত্রীভাব পোষণ (প্রসার) কর। এতে তোমার বিদ্বেষভাব প্রহীন হবে।'

'রাহুল, (সকলের প্রতি) দয়াভাব পোষণ (প্রসার) কর। এতে তোমার পরপীড়ন প্রবৃত্তি প্রহীন হবে।'

'রাহুল, (সকলের প্রতি) মুদিতা (পরের সুখে সুখী হবার) ভাব উৎপন্ন কর ও এর প্রসার কর। এতে তোমার অরতি (অপ্রসাদ) প্রহীন হবে।'

'রাহুল, (সকলের প্রতি) উপেক্ষা ভাবের উৎপত্তি ও প্রসার কর। এতে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রহীন হবে।'

'রাহুল অশুভভাব এর (ভোগের অশুচিতা) সম্পর্কে চিন্তা কর। এতে তোমার রাগ প্রবৃত্তির প্রহীন হবে।'

'রাহুল, সকল তত্ত্বের পরিবর্তনশীলতা (অনিত্য ভাবনা) সম্পর্কে চিন্তা কর। এতে তোমার অস্মিমান প্রহীন হবে।'

উপরোক্ত প্রাথমিক কৃত্যের নির্দেশ দানের পর বুদ্ধ আনাপান-স্মৃতি-ভাবনার বিধির পরিচয় দিয়ে বলেনঃ-

'রাহুল, অরণ্যে বা কোন এক গাছের নীচে বা শূন্যাগারে পদ্মাসনে বসে মেরুদণ্ড সোজা করে নাসিকাগ্রে বা উপরি ওষ্ঠের মধ্যভাগে স্মৃতি উপস্থাপন করতে হবে।'

'এরপর, রাহুল, স্মৃতিমান হয়ে আশ্বাস (আন) নিতে ও প্রশ্বাস (পান) ত্যাগ করতে হবে' যেমন-

১। (ক) দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণের সময় 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে জানতে হবে। (খ) দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগের সময় 'দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে

জানতে হবে।

২। (ক) হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণের সময়ে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে জানতে হবে। (খ) হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগের সময় 'হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে জানতে হবে।

৩। (ক) সারা শরীরে শ্বাস গ্রহণের অনুভব করব সংকল্প নিয়ে শ্বাস গ্রহণের অভ্যাস করবে। (খ) সারা শরীরে প্রশ্বাস ত্যাগের অনুভব করা ভেবে প্রশ্বাস ত্যাগের অভ্যাস করবে।

৪। (ক) কায়-সংস্কার প্রশমিত করে শ্বাস গ্রহণ করব সংকল্প নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করবে। (খ) কায় সংস্কার প্রশমিত করে প্রশ্বাস ত্যাগ করব সংকল্প নিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করবে।

৫। (ক) 'ধ্যানজ প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' সংকল্প নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করবে। (খ) 'ধ্যানজ প্রীতি অনুভব করে প্রশ্বাস গ্রহণ করব' সংকল্প নিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করবে।

৬। (ক) 'ধ্যানজ সুখ (বেদনা)ও অনুভব করে (উৎপত্তি জেনে জেনে) শ্বাস গ্রহণ করব' সংকল্প নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করবে। (খ) 'ধ্যানজ সুখ (বেদনা) অনুভব করে (উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ) জেনে জেনে প্রশ্বাস ত্যাগ করব' সংকল্প নিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করবে।

৭। (ক) 'চিত্ত-সংস্কারের (সংজ্ঞা বেদনা) উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ জেনে জেনে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' সংকল্প নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করবে। (খ) 'চিত্ত-সংস্কারের (সংজ্ঞা বেদনার উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশ জেনে জেনে অনুভব করে প্রশ্বাস ত্যাগ করব'- সংকল্প নিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করবে।

৮। (ক) 'স্থূল চিত্ত-সংস্কার প্রশমিত করে শ্বাস গ্রহণ করব' সংকল্প

নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করবে। (খ) 'স্থূল চিত্ত-সংস্কার প্রশমিত করে 'প্রশ্বাস ত্যাগ করব' সংকল্প নিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করবে।

৯। (ক) 'চিত্ত-প্রতিসংবেদী হয়ে শ্বাসগ্রহণ করব' সংকল্প নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করবে। (খ) 'চিত্ত-প্রতিসংবেদী হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করব' সংকল্প নিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করবে।

১০। (ক) 'চিত্ত প্রমোদিত করে শ্বাস গ্রহণ করব' সংকল্প নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করবে। (খ) 'চিত্ত প্রমোদিত করে প্রশ্বাস ত্যাগ করব' সংকল্প নিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করবে।

১১। (ক) (প্রথম ধ্যানাদি ভেদে আলম্বনে) 'চিত্ত সম্যক্‌রূপে স্থাপন করে শ্বাস গ্রহণ করব' সংকল্প নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করবে। (খ) (প্রথম ধ্যানাদি ভেদে আলম্বনে) 'চিত্ত সম্যক্‌রূপে স্থাপন করে প্রশ্বাস ত্যাগ করব' সংকল্প নিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করবে।

১২। (ক) (নীবরন ও স্থূল ধ্যানাঙ্গ হতে) 'চিত্ত বিমোচন করে শ্বাস গ্রহণ করব' সংকল্প নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করবে। (খ) (নীবরন ও স্থূল ধ্যানাঙ্গ হতে) 'চিত্ত বিমোচন করে প্রশ্বাস ত্যাগ করব' সংকল্প নিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করবে।

১৩। (ক) (পঞ্চ স্কন্ধের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ) 'অনিত্য লক্ষণ পর্যবেক্ষণপূর্বক (নিত্য সংজ্ঞা মুক্ত হয়ে) শ্বাসগ্রহণ করব' সংকল্প নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করবে। (খ) (পঞ্চ স্কন্ধের উৎপত্তি স্থিতি বিনাশ) 'অনিত্য লক্ষণ পর্যবেক্ষণপূর্বক (নিত্য সংজ্ঞা মুক্ত হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করব' সংকল্প নিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করবে।

১৪। (ক) (ক্ষয় ও অত্যন্ত বিরাগ ভেদে দু প্রকার) 'বিরাগানুদর্শী (আসক্তি রহিত) হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' সংকল্প নিয়ে শ্বাসগ্রহণ করার

অভ্যাস করবে। (খ) (ক্ষয় ও অত্যন্ত বিরাগ ভেদে দু'প্রকার) 'বিরাগানুদর্শী (আসক্তি রহিত) হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' সংকল্প নিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করার অভ্যাস করবে।

১৫। (ক) 'নিরোধানুদর্শী (সমুদয়মুক্ত) হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' সংকল্প নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করার অভ্যাস করবে। (খ) 'নিরোধানুদর্শী (সমুদয়মুক্ত) হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করব' সংকল্প নিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করার অভ্যাস করবে।

১৬। (ক) (পরিত্যাগও প্রধানত এ দু'প্রকার) 'প্রতি বিসর্জনানুদর্শী (আদানমুক্ত চিত্ত) হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' সংকল্প নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করবে অভ্যাস করবে। (খ) (পরিত্যাগও প্রধানত এ দু'প্রকার) 'প্রতি বিসর্জনানুদর্শী (আদানমুক্ত চিত্ত) হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করব' সংকল্প নিয়ে প্রশ্বাস গ্রহণ করার অভ্যাস করবে।

আনাপান-স্মৃতি-ভাবনার ষোল প্রকার বিধি নির্দেশ প্রদানের পর রাহুলকে আশ্বাসন দিয়ে বুদ্ধ বলেন--- 'রাহুল, এভাবে ভাবিত ও বহুলীকৃত আনাপান-স্মৃতি (ঐহিক) মহান ফলদায়ক ও (পারত্রিক) অভিষ্ট সুপরিণাম দেয়। এভাবে ভাবিত ও বহুলীকৃত আনাপান-স্মৃতি সহকারে যেসব শেষ শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করা হয় সবই জ্ঞাতসারেই নিরুদ্ধ হয়। অজ্ঞাত-সারে কিছুই হয় না।'

তথাগত বুদ্ধের এ উপদেশ সূত্র-পিটকের মধ্যমনিকায়ের **মহারাহুলোবাদ-সুত্ত** নামে সংগৃহীত রয়েছে।

অক্ষরে অক্ষরে এর মর্মার্থ বুঝতে পেরে রাহুল সাধুবাদ দিয়ে অভিনন্দন করেন। এর পর রাহুল স্মৃতি-ভাবনার অভ্যাসে রত হন। এভাবে পিতা বুদ্ধ ও দীক্ষাগুরু শারীপুত্র উভয়ের স্নেহে ও তত্ত্বাবধানে রাহুলের আনাপান-স্মৃতি-ভাবনার হাতে খড়ি হয়।

মাঝে মধ্যে রাহুলের মানসিক পরিবর্তন ও আধ্যাত্মিক প্রগতি লক্ষ্য করে বুদ্ধ তার উৎসাহ আরো বাড়ানোর উদ্দেশ্যে একাধিকবার নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে উপদেশ দেন। এদের অধিকাংশ রাহুল-সুত্ত নামে সুত্রপিটকের নানা নিকায়ে সংগৃহীত রয়েছে। আর কিছু উপদেশের সংগ্রহ সংযুক্ত-নিকায়ের রাহুল-সংযুক্ত নামক খণ্ডে রয়েছে।

এভাবে কয়েকবার উপদেশ শ্রবণের সুপরিণামে কয়েক পর্যায়ে আধ্যাত্মিক প্রগতির পর রাহুলের অরহত্ব প্রাপ্তি ঘটে। এ ঘটনার বিবরণ রাহুল-সুত্তে উপলব্ধ হয়। এ সুত্রকে চুল-রাহুলোবাদ-সুত্তও বলা হয়।

রাহুলের সমবয়স্ক বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা ছিল অনেক। এদের সবাই ছিল সমমনা। রাহুল ছিল সকলের প্রিয়। তারা তাঁকে আদরের সুরে 'রাহুল ভদ্র' বলে সম্বোধন করতো।

বুদ্ধের ঔরস-পুত্র ও ধর্ম-পুত্র হওয়ায় রাহুল তাঁর বন্ধু-বান্ধবের 'রাহুল ভদ্র' সম্বোধন স্বীকার করে বলতেন--- আমি প্রকৃতই এ সম্বোধনের অধিকারী।

অরহত্ব-ফল প্রাপ্তির পর রাহুলের চাঞ্চল্যতা দূর হয়ে যায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে আলোকনে বিলোকনে সংযত ভাব পরিলক্ষিত হয়। দেহ-কান্তি ফুটে ওঠে।

এই চরম আধ্যাত্মিক উন্নতিতে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও প্রবল আত্মবিশ্বাস জাগে। ধ্যানরত অনেকে আর্য-মার্গ-ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাহুলের উদ্দেশ্যে দেওয়া বুদ্ধের উপদেশগুলোর সবই দেহাভ্যন্তরস্থ ভৌতিক তত্ত্বের অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম তিন লক্ষণ পরিচায়ক। উপদেশে অষ্টাঙ্গিক মধ্যম মার্গ, শমথ ও স্মৃতিপ্রস্থান (**বিপস্সনা**)

ভাবনার বিধি-বিধানের সারাংশ রয়েছে। এ সবের অধ্যয়ন হতে দেহের (১) কেশ, (২) লোম, (৩) নখ, (৪) দন্ত, (৫) ত্বক, (৬) মাংস, (৭) স্নায়ু, (৮) অস্থি, (৯) অস্থি-মজ্জা, (১০) মুত্রাশয়, (১১) হৃৎপিণ্ড, (১২) যকৃৎ, (১৩) ক্লোম, (১৪) প্লীহা, (১৫) ফুসফুস, (১৬) বৃহৎ অন্ত্র, (১৭) ক্ষুদ্রান্ত্র অন্ত্র-গুন (বন্ধনী), (১৮) পাকাশয়, (১৯) বিষ্ঠাশয় (২০) মগজ, (২১) পিত্ত, (২২) শ্লেষ্মা, (২৩) পুঁজ, (২৪) রক্ত, (২৫) স্বেদ, (২৬) মেদ, (২৭) অশ্রু, (২৮) চর্বি, (২৯) থুথু, (৩০) শিখনি, (৩১) গ্রন্থির তরল পদার্থ, (৩২) মুত্র। মগজাদি জলীয় তত্ত্বের (আপো ধাতুর) স্বরূপ এবং অশুচিতা সম্পর্কে চিন্তনের সুপরিণাম জ্ঞাত হয়।

একবার কুরু রাজ্যের (বর্তমান দিল্লী, হরিয়ানা ও পাঞ্জাব) 'কল্মাস ধর্ম-নগরীতে ভগবান বুদ্ধ বিহার করছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন এমন ভিক্ষুগণকে সমবেত করিয়ে 'স্মৃতি-প্রস্থান-সূত্রে'র উপদেশ দিয়ে বলেনঃ-

"হে ভিক্ষুগণ, প্রাণীগণের বিশুদ্ধি ও শোক-পরিদেবনের অতিক্রমনে দুঃখ-দৌর্মনস্যের সমাপ্তি, ন্যায়ের প্রাপ্তি, নির্বাণ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে স্মৃতি-প্রস্থান একমাত্র মার্গ। এর অন্য আর কোন বিকল্প নেই।

বুদ্ধোপদিষ্ট স্মৃতি-প্রস্থান চার প্রকারঃ-

(১) কায়ানুদর্শন (কায়ানুস্মৃতি),

(২) বেদনানুদর্শন (বেদনানুস্মৃতি),

(৩) চিত্তানুদর্শন (চিত্তানুস্মৃতি),

(৪) ধর্মানুদর্শন (ধর্মানুস্মৃতি)।

কায়ানুদর্শনের আবার নিম্নলিখিত ছয়টি পরিপূরক অঙ্গ রয়েছে:-

(১) আনাপান-স্মৃতি,

(২) ঈর্যাপথ-স্মৃতি,

(৩) সম্প্রজ্ঞানকারী,

(৪) প্রতিকূল মনসিকার,

(৫) ধাতু মনসিকার ও

(৬) অশুভানুস্মৃতি।

'স্মৃতিপ্রস্থান-সূত্রে এসবের প্রত্যেকটির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এ গ্রন্থের অনাবশ্যক কলেবর বৃদ্ধি হবে শঙ্কায় রাহুলের উদ্দেশ্যে উপদিষ্ট মহারাহুলোবাদ-সুত্তের উল্লিখিত পাঁচ প্রকার ধাতুতে অনাত্ম-ভাবনার সাথে স্মৃতিপ্রস্থান-সূত্রে উল্লিখিত প্রতিকুল-মনসিকারের অভিন্ন সম্বন্ধ প্রদর্শন হেতু এতে বর্ণিত মূল পাঠ এখানে তুলে ধরা হল।

'সেয়্যথাপি, ভিক্খবে, উভতোমুখা পুতোলি পূরা নানা বিহিতস্স ধঞ্ঞস্স সেয়্যথীদং-সালীনং বীহীনং মুগ্গানং মাসানং তিলানং তণ্ডুলানং। তমেনং চক্খুমা পুরিসো মুঞ্চিত্বা পচ্চবেক্খেয়্য ইমে সালী ইমে বীহী ইমে মুগ্গা ইমে মাসা ইমে তিলা ইমে তণ্ডুলাতি ।

এবমেব খো, ভিক্খবে, ভিক্খু ইমমেব কায়ং উদ্ধং পাদতলা, অধো কেসমত্থকা তচপরিয়ন্তং পূরং নানাপ্পকারস্স অসুচিনো পচ্চবেক্খতি---- অত্থি ইমস্মিং কায়ে কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো, মংসং, ন্হারু, অট্ঠি, অট্ঠি-মিঞ্জং, বক্কং, হৃদয়ং, যকনং, কিলোমকং, পিহকং, পপ্ফাসং অন্তং, অন্তগুনং, উদরিয়ং, করীসং, পিত্তং, সেম্হং, পুব্বো,

লোহিতং, সেদো, মেদো, অস্‌সু, বসা, খেলো, সিঙ্গানিকা, লসিকা, মুত্তং' তি।

মজ্ঝিমনিকায়- ১. ১০. ২. ৪ পৃঃ ৭৮- ৭৯

সাধারণত মানুষ তার অজ্ঞানতার (অবিদ্যা ও অবিদ্যাজাত আসক্তির রাগ) কারণে অজ্ঞানে নিজ দেহের প্রতি মমত্ব বোধ বাড়ায়। মমত্ববোধ বৃদ্ধির সাথে আমিত্বও (অহং ভাব) বেড়ে যায়। আমিত্ব খর্বিত হলে ক্রোধ বেড়ে যায়। এভাবে দুঃখ ও সমস্যার পরিমাণ ও জটিলতা ক্রমশ অধিকতর হতে থাকে।

বাহ্য সৌন্দর্যের সন্ধানী ইন্দ্রিয়ে অসংযমী, মিতাহারী, আলস্য পরায়ণ ও হীনবীর্য ব্যক্তি ঝড়-ঝঞ্ঝাহত দূর্বল বৃক্ষের ন্যায় মার কর্তৃক (রিপুগণের আক্রমণে) পরাভূত হয়। (ধর্মপদ) চরম ও পরম সুখশান্তি প্রাপ্তির আশা ও আকাঙ্খা এমন মানুষের জীবনে সুদূর পরাহত থাকে।

এর ঠিক বিপরীত এক ঘন শিলাময় পবর্তকে যেমন ঝড়-ঝঞ্ঝা টলাতে পারে না অনুরূপ-ভাবে দৈহিক অশুভ তত্ত্বানুদর্শী, ইন্দ্রিয়-সংযমী, মিতাহারী শ্রদ্ধাবান ও বীর্যবান (উদ্যমী) ব্যক্তিকেও মার কখন প্রভাবিত করতে পারে না। অচিরেই চরম ও পরম সুখ শান্তি প্রাপ্তির আশা এদের পরিপূর্ণ হয়।

স্মৃতি-প্রস্থান-সূত্র হতে উদ্ধৃত উপরোক্ত অংশে বুদ্ধকে দেহের ঘৃণ্য তত্ত্বসমূহের সম্পর্কে অনুচিন্তনীয় বিধির এক বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় দিতে পাই।

কোন এক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি (আপাত দৃষ্টিতে সুন্দর বলে মনে হয় এমন) শালী, বীহী, মুগ, মাস, তিল, তণ্ডুলাদি বিবিধ শষ্যে পরিপূর্ণ দু-মুখ বিশিষ্ট এক ব্যাগ (বস্তা) দেখে দু মুখ খুলে উপরোক্ত শষ্যরাশি পৃথকভাবে রেখে নিরীক্ষণ করে-- এগুলো (হল) সালী, এগুলো হল

বীহী, এগুলো (হল) মুগ, এগুলো (হল) মাস, এগুলো (হল) তিল, আর এগুলো (হল) তণ্ডুল। তদনুরূপভাবে এক আনাপান-স্মৃতি-ভাবনাকারীকেও (বিদর্শন সাধক) নীচে পায়ের তল হতে উর্ধে মস্তকের কেশ অবধি সীমায় ত্বচায় আবৃত এবং অশুচি তত্ত্বে পরিপূর্ণ নিজ বা পরদেহ দর্শন করা মাত্রই চিন্তা করা উচিৎ এ শরীরে রয়েছে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বচা, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বক্ষ, হৃদয়, যকৃত, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদরস্থ খাদ্যদ্রব্য, বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু, শিখনি, গ্রন্থি তরল পদার্থ, মুত্র।

কায়ানুদর্শন-স্মৃতি-ভাবনায় পরিপক্ক হবার পর সাধককে নিজ অস্তিত্বের আভ্যন্তরীন বাহ্য অনুভূতিময় জগতের প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির (বেদনা) উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ, এদের উৎপত্তির কারণ, এদের নিরোধ, এদের নিরোধের উপায়াদির অনুদর্শন বা বিশেষ দর্শন সম্যক্ স্মৃতির সাথে করতে হয়। এ বিধিকে বলা হয় বেদনানুদর্শন-স্মৃতি বা বেদনানুপশ্যনা। এ স্মৃতি-ভাবনার পরিণামে সাধক স্মৃতিমান থাকায় অনুভূতির স্থিতি ও বিনাশে প্রভাবিত হয় না, বরং নিরপেক্ষ ও যথাযথভাবে ওসবকে জানে। অপ্রভাবিত থেকে বিহার করে। বেদনা স্কন্ধে উপাদান রহিত হয়ে বিহার করায় কায় (রূপ)-এর প্রতি তার উপাদান হয় না।

বেদনানুদর্শন-স্মৃতি-ভাবনায় সিদ্ধি লাভের পর সাধককে নিজে অস্তিত্বের আভ্যন্তরীন মনোময় জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিটি বেদনার (অনুভূতি) উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ, এবং ওসবের লোকীয় হতে লোকোত্তর স্তরের উন্নীত হবার উত্তরোত্তর ক্রমিক পরিবর্ত্তন অর্থাৎ এদের উৎপত্তির কারণ, এদের নিরোধ ও নিরোধের উপায়ের অনুদর্শী হতে হয়। স্মৃতিমান সাধক নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্ম বিদর্শক হওয়ায় ওসবের

প্রতি অনাসক্ত থেকে বিহার করেন। বেদনা-স্কন্ধের প্রতি উপাদান রহিত হয়ে বিহার করতে সমর্থ হয়। এ ভাবনাকে বেদনানুদর্শন-স্মৃতি বলা হয়।

বেদনানুদর্শনে দক্ষতা লাভের পর সাধককে চিত্তানুদর্শী হয়ে বিহার করতে হয়। এ অবস্থায় সাধক তার অন্তর-জগতে উৎপন্ন প্রতি চিত্তের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মরূপে ও স্মৃতি সহকারে জানে। এর সুপরিণামে সাধক অনাসক্ত হয়ে বিহার করে। ওসবের প্রতি উপাদান রহিত হয়ে বিহার করে। একেই বলা হয় চিত্তে চিত্তানুদর্শী।

চিত্তানুদর্শনে দক্ষতা লাভের পর সাধককে প্রতিটি চিত্তের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের সাথে উৎপন্ন নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারের সহজাত ধর্মের বৃদ্ধির পুঙ্খানুপুঙ্খ-অনুদর্শন করতে বলা হয় :–

(১) পাঁচ প্রকার নীবরণ,

(২) পাঁচ স্কন্ধের প্রতি উৎপন্ন উপাদান,

(৩) ছয় প্রকার আভ্যন্তরীন ও তাদের বাহ্য আয়তন,

(৪) সাত প্রকার বোধ্যঙ্গ ও

(৫) চার প্রকার আর্যসত্য।

এ স্মৃতিপ্রস্থান-ভাবনা আপাতত চার প্রকারের হলেও এরা একে অপরের অঙ্গপূরক। বাস্তবিকতায় এটি চার অঙ্গ বিশিষ্ট একায়ন মার্গ। প্রাণীগণের বিশুদ্ধিতা অর্জনের, শোক-পরিদেবন সমতিক্রমনের, দুঃখ-দৌর্মনস্যের সমাপ্তির, ন্যায়ের প্রাপ্তির এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ-করণের উদ্দেশ্যে এ একায়ন মার্গ একমাত্র মার্গ। এর অন্য কোন বিকল্প নেই।

স্মৃতিপ্রস্থান-সূত্রের শেষে এ ভাবনার সুনিশ্চিত মহান ফল সম্পর্কে অবহিত করিয়ে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে সম্বোধন করে বলেন :-

অধিকাধিক কাল ভাবনা করার সুফলের কথা তো দুরে থাকুক কেহ যদি মনোযোগ সহকারে অন্তত পক্ষে এক সপ্তাহ এ ভাবনা করতে পারে, সে আর্য-মার্গ-ফলের কোন না কোন একটিতে অবশ্যই উন্নীত হবে।

উপরোক্ত বর্ণনা হতে বৌদ্ধ ধ্যান-ধারণায় তত্ত্বের অনুচিন্তনের গুরুত্ব ও ভূমিকা স্পষ্ট হয়। এখানে এও উল্লেখনীয় যে অবৌদ্ধ ভারতীয় বা অন্য প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্যে বা ধ্যান-ধারণায় কেবল কাল্পনিক ভগবৎ ভক্তিকেই ভগবৎ প্রাপ্তি, দুঃখ-মুক্তি বা মোক্ষ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়রূপে স্বীকৃতি পায়। দুঃখ-মুক্তি বা মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়রূপে দৈহিক ঘৃণ্য অশুচি তত্ত্বের চিন্তনের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ কোন চর্চা ওসবে পরিলক্ষিত হয় না। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তথাগত বুদ্ধই প্রথম ব্যক্তি যিনি মানবের দেহতত্ত্বকে মানবের বিবিধ সমস্যার সমাধানের, মোক্ষ (নির্বাণ) প্রাপ্তির এবং এমন কি বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির এক সরল অথচ মোক্ষম উপায়রূপে ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে তিনি মুমুক্ষু মানুষকে কাল্পনিক ভগবানের দাসত্বের বন্ধন হতে চিরতরে মুক্তি দান করেছেন। মানুষকে আজ তার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হবার প্রয়োজন নেই। সে আজ স্বাধীন। সে আজ স্বাবলম্বী।

আগারিক ও অনাগারিক জীবনচরিয়াভেদে মানুষের পালনীয় শীল ও শিক্ষাপদসমূহের বিবিধতা থাকলেও আধ্যাত্মিক প্রগতির পথ একই। একারণে বুদ্ধের উপদেশ, সে মহারাহুলোবাদ-সুত্তই হউক বা সতিপট্ঠান-সুত্ত হউক, ওসবের ভাবনা-বিধি আগারিক ও অনাগারিক উভয় শ্রেণীর মানুষের প্রযোজ্য।

এ কারণে খুদ্দক-পাঠের সংকলক, সে যেই হউক না কেন, আগারিক ও অনাগারিক উভয় শ্রেণীর মানুষের হিতার্থে দৈহিক বত্রিশ প্রকারের ঘৃণ্য অশুচিময় তত্ত্ব-কথাকে 'দ্বাত্তিংসাকার' নামে তৃতীয় পাঠরূপে এতে সংযোজন করেছেন।

'দ্বাত্তিংসাকার'-এর মূল পাঠের সাথে মহারাহুলোবাদ-সুত্তের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকলেও পরোক্ষ সম্বন্ধ অবশ্যই রয়েছে। তবে সতিপট্ঠান-সুত্ত-এর সাথে যে এর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে এতে কোন সন্দেহ নাই। প্রমাণের ভিত্তিতে এ পাঠের বিষয়-বস্তুকে নিঃসন্দেহে বুদ্ধবাণী বলা যেতে পারে।

৪। কুমারপঞ্হা:-

এ গ্রন্থের চতুর্থ পাঠ 'কুমারপঞ্হা' নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। এ পাঠে দশটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও তার দশটি সংক্ষিপ্ত উত্তরের সমাবেশ রয়েছে। এসবের প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তর-দাতার নামোল্লেখ এতে মেলে না।

তবে (ক্ষুদ্রকপাঠ, ধর্মপদ, অপদান গ্রন্থাদির অর্থকথা) হতে প্রাপ্ত বর্ণনার ভিত্তিতে কুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং 'কুমারপঞ্হা' পাঠের অন্তর্গত প্রশ্নোত্তর দানের প্রসঙ্গ-কথা এখানে তুলে ধরা হল।

পালি সাহিত্যে সোপাক নামে দুই কুমারের বাল্যাবস্থায় বুদ্ধের সান্নিধ্যে অরহত্ব ও প্রব্রজ্যা-ধর্মে দীক্ষা লাভের ঘটনার উল্লেখ থাকায় 'কুমার-পঞ্হা'র কুমারের জীবনী চয়নে একটু বেগ পেতে হয়।

'কুমার-পঞ্হা'য় উক্ত সোপাক (কুমার)-এর মাতা-পিতার নাম, বাসস্থান ও পেশার সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এক পরম্পরায় এই কুমারকে এক ব্যবসায়ীর পরিবারজাত বলে বলা হয়। অপর

পরম্পরানুসারে এই কুমার এক শ্মশানরক্ষক গরীব চণ্ডাল-পুত্র। একারণে এর নাম রাখা হয়েছিল সোপাক। জন্মের চার মাস পরই সোপাকের পিতা কাল কবলিত হয়। আর্থিক দুরাবস্থার দরুন জন্মের পর সোপাককে তার কাকার পরিবারে পালিত হতে হয়। সাত বছর বয়সে একদিন তার কাকা ও ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় কাকা তার হাত পা এক মৃত দেহের সাথে বেঁধে শ্মশানে ফেলে আসে যেন শিয়ালাদি হিংস্র জন্তু তাঁকে খেয়ে ফেলে। মাঝরাতে কয়েকটি শিয়াল এসে মরদেহ নেড়ে চেড়ে খেতে আরম্ভ করলে সোপাক কুমার উঁচু স্বরে কান্নাকাটি করতে থাকে। এদিকে মাঝরাতে সোপাকের কান্নার করুণ শব্দ শুনে মহাকারুণিক তথাগতের হৃদয় বিগলিত হয়। বালকের ভূত-ভবিষ্যতে দিব্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঐ বালকের নিষ্কলুষ চিত্তে এক দিব্য রশ্মি প্রেরণ করেন। দিব্য রশ্মির শক্তিতে বালক সোপাক বন্ধন মুক্ত হয়। শুধু তাই নয় অজান্তে ঐ বালক শ্রাবস্তীর গন্ধকুটি বিহারে বুদ্ধের সামনে উপস্থিত হয়। বুদ্ধের অপূর্ব উপদেশ শ্রবণের সুপরিণামে সে স্রোতাপন্ন হয়।

অন্যদিকে সোপাকের মা ঐ পরিবারের কারও কাছ হতে কোন প্রকারের সন্ধান না পেয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। শেষে সর্বজ্ঞ বুদ্ধের কাছ হতে ছেলের নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া যাবে এই আশায় আশান্বিত হয়ে সোপাকের মাও গন্ধকুটি বিহারের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সোপাক ও তার মা এদের উভয়েরই আধ্যাত্মিক হিত-সাধনার্থে সোপাকের মার আগমনভাব জানতে পেরে তথাগত বুদ্ধ এক উপায়-কৌশল্যের প্রয়োগ করেন। নিকটে বসে থাকা সোপাককে যেন তার মা দেখতে না পান, এমন ঋদ্ধি-শক্তির কৌশল শাস্তা প্রয়োগ করেন।

সোপাকের মার মানসিক অশান্তি শান্ত করে সমাধিমুখী করার উদ্দেশ্যে

শাস্তা উপদেশ দিয়ে বলেন- 'পুত্রকন্যা স্বজনপরিজন কেহই প্রকৃত শরণ-স্থল নয়। আপন পুণ্যকর্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শরণ স্থল।' এভাবে প্রেরণামূলক ধর্মোপদেশ দান করেন। ধর্মোপদেশ শুনে তার মায়ের মন শান্ত হয়। সমাধিস্থ হয়। তার মা ঐ বসাতেই স্রোতাপন্ন হয়। ঐ একই ধর্মোপদেশ শুনে পাশে বসে থাকা সোপাক কুমার অর্হৎ হয়ে পড়ে। দু'জনের পরিপক্ক মানসিক স্থিতির কথা জানতে পেরে সোপাককে সোপাকের মার দৃষ্টি-গোচরীভূত করেন। ভিক্ষু-সংঘে প্রবেশ করে পবিত্র অনাগারিক জীবনযাপনের সদিচ্ছা ব্যক্ত করলে সোপাকের মা স্বেচ্ছায় অনুমতি প্রদান করে তার আধ্যাত্মিক পথ প্রশস্ত করে দেন।

বুদ্ধ চাইলে একাই সোপাককে উপসম্পদা দিতে পারতেন। সোপাকের অরহত্ব প্রাপ্তির সূচনা দেওয়ার ও উপসম্পদা লাভের যোগ্যতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শাস্তা উপসম্পদা দানের এক নতুন বিধি প্রচলনের আদেশ দেন। এ উদ্দেশ্যে ভিক্ষু-সংঘকে আহ্বান করেন। ভিক্ষু-সংঘের সমক্ষে বুদ্ধ সোপাককে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের পরমার্থ বিষয়ক দশটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করেন। সোপাকও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীর যথাযোগ্য সংক্ষিপ্ত উত্তর দান করে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে সন্তুষ্টি প্রদান করেন। বুদ্ধোপদিষ্ট ধ্যান-ধারণায় পরিপক্ক জ্ঞান না থাকলে মাত্র সাত বছরের বালকের পক্ষে কোন প্রকারের অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ ব্যতীত এই সব পারমার্থিক প্রশ্নাবলীর যথাযথ উত্তর দান কদাপি সম্ভব নহে।

প্রশ্নোত্তরগুলি সংবাদ-শৈলীতে এই পাঠে সংযোজিত হয়েছে। সোপাকের উপসম্পদা দানের বেলায় পূর্ব প্রচলিত বিধি উপসম্পদা দানের এ বিধি ঐ সময় হতে **'পঞ্ঞেহাত্তর উপসম্পদা'** রূপে বৌদ্ধ সাহিত্যে সুবিদিত হয়ে পড়ে।

নামের সার্থকতা:-

এ নামের সার্থকতা দর্শানোর পৃষ্টভূমিরূপে মিলিন্দপ্রশ্ন নামকরণের প্রসঙ্গটি এখানে চর্চিত হলে, অযৌক্তিক হবে না।

মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের প্রশ্নকর্ত্তা স্বয়ং মিলিন্দই ছিলেন। এ দৃষ্টিতে 'মিলিন্দপ্রশ্ন' শব্দের অর্থ যদি 'মিলিন্দের (কৃত) প্রশ্ন' (সমূহ) করা হয় তা হলে তা যুক্তিসঙ্গতই হবে।

'কুমারপঞ্হা'য় উৎত্থাপিত প্রশ্নোত্তর দানের পটভূমি না জেনে যদি কেহ 'কুমারপঞ্হা' শব্দের অর্থ 'কুমারের (কৃত) প্রশ্ন (সমূহ)' করে ফেলে তা নিতান্তই ভ্রান্তিকর হবে। কারণ এখানে কুমার প্রশ্নকর্তা নয়, প্রশ্নকর্ত্তা বুদ্ধ স্বয়ং। কাজেই 'কুমারপঞ্হা' শব্দের অর্থ 'কুমারের (কৃত) প্রশ্ন' না হয়ে 'কুমারকে কৃত প্রশ্ন (সমূহ)' হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

সাত বছরের কচিকাঁচা কিশলয় সোপাকের অরহত্ব প্রাপ্তি, সঠিক উত্তর দান ও উপসম্পদা প্রাপ্তির ঘটনা নিঃসন্দেহে অপর কিশোর বালক ও মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট এক আদর্শ ও প্রেরণাদায়ক বিরল ঘটনা। এ ঘটনার প্রতি পাঠকগণের সুদৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এ পাঠের নাম অন্য কিছু না রেখে 'কুমারপঞ্হা' রাখাটা অত্যন্ত সার্থক হয়েছে।

৫। মঙ্গল-সুত্ত

প্রাণীমাত্রই নিজেকে ভালবাসে। এ মূল কারণেই প্রাণীরা একে অপরকে ভালবাসে আর আদর করে। আর এ কারণেই প্রত্যেক প্রাণী এবং বিশেষ করে মানুষ নিজেকে রোগ, শোক ও সমস্যা মুক্ত রেখে মঙ্গলময় করে রাখার প্রয়াস করে। এখানে মঙ্গলময় বলতে সর্ববিধ সুখে সুখী জীবন বোঝাচ্ছে।

জীবনকে মঙ্গলময় করার প্রয়াসে মানুষ নানাপ্রকারের উপায় অবলম্বন করে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় অজ্ঞানতার কারণে মানুষ অমঙ্গলকে মঙ্গল, মঙ্গলকে অমঙ্গল, গুরুত্বহীন ঘটনাকে গুরুত্বপূর্ণ, ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে গুরুত্বহীন মনে করে মারাত্মক ভুল করে ও দিগ্‌ভ্রমিত হয়। জীবনকে সে বিষিয়ে তুলে। মঙ্গলময় করে তোলার স্থলে এ জীবনকে অমঙ্গলময় করে তোলে।

মানবের জীবনে যত্র যত্র এমন কিছু প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যা তার ভাবী জীবনের সুখ-দুঃখের পূর্ব-সংকেতরূপ ক্রিয়া করে। রোগ, শোক, সমস্যা ও দুঃখোৎপত্তির এবং মান, যশ, লাভ, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি হ্রাসের পূর্ব- সংকেতরূপে ক্রিয়া করেছে বা ঘটেছে এমন সব ঘটনাকে অমাঙ্গলিক লক্ষণ (নিমিত্ত) আখ্যা দেওয়া হয়। রোগ, শোক ও সমস্যা হ্রাসের আর মান, যশ, লাভ, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির পূর্বসংকেত রূপে ঘটেছে এমন সব ঘটনাকে মাঙ্গলিক লক্ষণ রূপে আখ্যা দেওয়া হয়। মানুষ যে তার পূর্বকৃত (পাপ বা পূণ্য) কর্মের পরিণামস্বরূপ সুখ বা দুঃখ লাভ করে সেটা ভুলে গিয়ে ঐ লক্ষণ বা নিমিত্তকে (মাঙ্গলিক বা অমাঙ্গলিক) অধিক গুরুত্ব দিয়ে ফেলে। সে মনে করে এক বিশেষ মাঙ্গলিক লক্ষণ বা নিমিত্ত প্রাদুর্ভুত হওয়ায় তার জীবনে নাম, যশ, সুখ ও সমৃদ্ধি এসেছে। অথবা অমাঙ্গলিক নিমিত্তের দর্শনে জীবনে নাম, যশ, ও সুখ-সমৃদ্ধির হ্রাস হয়। আর অপমান, রোগ, শোক, পরিদেবনাদি দুঃখের বৃদ্ধি হয়। অন্যথা হয় না। এ ধরনের ঘটনা পরের জীবনে কয়েকবার ঘটতে দেখা গেলে মানব মনে গভীর ছাপ ফেলে। ভীত শংকিত মনে মানুষ প্রয়াস করে যাতে সে তার শয়নে, গমনে, উপবেশনে বা স্থিতি অবস্থায় কোন প্রকারের অমাঙ্গলিক লক্ষণ না দেখে।

অমাঙ্গলিক লক্ষণের উৎপত্তি, রোধ ও তদ্স্থলে মাঙ্গলিক লক্ষণের উৎপত্তির উপায় সম্পর্কে একে অপরের সাথে চর্চা করে। ক্রমশ তা সমাজের চর্চার বিষয় হয়ে পড়ে। সমস্যার সমাধানার্থে শ্রুতি পরম্পরাগত মাঙ্গলিক ও অমাঙ্গলিক নিমিত্ত সংগৃহীত হতে থাকে। সাথে অমাঙ্গলিক নিমিত্ত রোধের ও মাঙ্গলিক নিমিত্ত উৎপত্তির বিবিধ বিধি-বিধানের সংকেতও উপলব্ধ হয়।

এ সবের সংকেত ও বর্ণনা প্রায় প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় লিখিত প্রায় সব ধর্ম সাহিত্যে পাওয়া যায়। পালি ভাষায় রচিত মূল পিটক ও অর্থকথা সাহিত্যের যত্র তত্র এর বর্ণনা রয়েছে। বিশেষত দীর্ঘ-নিকায়ের ব্রহ্মজাল-সূত্রে ও জাতক সাহিত্যে এ ধরনের সাহিত্যিক উপকরণ প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান। বৌদ্ধ সাহিত্যে এসবের উল্লেখ থাকলেও বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী-সংঘ যে এসবকে সমর্থন করতেন তা সিদ্ধ হয় না। এ সব সাহিত্যে বুদ্ধকালীন ভারতীয় সমাজে প্রচলিত পরম্পরার প্রতিফলন হয়েছে মাত্র।

এ পরম্পরার প্রারম্ভ কবে হয়েছে তার সঠিক কাল নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। এসবে মানুষের বিশ্বাস বুদ্ধের সময়ও ছিল, আর আজও রয়েছে। অমাঙ্গলিক লক্ষণাদির উৎপত্তি রোধের নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন হওয়া সত্ত্বেও আজও সাধারণ মানুষ নিজেকে এসব হতে পূর্ণত মুক্ত করতে পারেনি। সময়ে সময়ে এ সমস্যা বিকট রূপ ধারণ করে। অমঙ্গল বর্জন করে কিসে মঙ্গল হয়?--- আদি জিজ্ঞাসা জনিত কোলাহল সমাজে দেখা দেয়। পালি সাহিত্যে এ কোলাহল 'মঙ্গল কোলাহল' রূপে বর্ণিত হয়েছে। পালি সাহিত্যে অতি চর্চিত পাঁচ প্রকার কোলাহল এরূপ:-

১। কল্প কোলাহল, ২। বুদ্ধ কোলাহল, ৩। চক্রবর্ত্তী কোলাহল, ৪।

মঙ্গল কোলাহল, ৫। মোনেয়্য কোলাহল। এই পাঁচ প্রকার কোলাহলের মধ্যে মঙ্গল কোলাহলটি অন্যতম।

কল্পকল্পান্তর পর মানব-সমাজে কোন এক বুদ্ধের উৎপত্তি হলেই এ ধরণের মঙ্গল কোলাহলের উৎপত্তি হয়।

আমাদের এ গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায়ও এ সমস্যা একবার চিন্তাশীল ব্যক্তির দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কেহ বলতেন সকালে উঠে চাতক পাখী দেখা মঙ্গল হয়। কেহ বলতেন বাঁশের লাঠি দেখা ভাল। কেহ বলতেন গর্ভবতী স্ত্রী দেখা ভাল। কারো মতে অলঙ্কৃত পূর্ণ কলস দর্শন মঙ্গলকর। কেহ এসবকে অস্বীকার করে বলতেন পূর্ণ যুব বৃষ দেখতে পেলেই মঙ্গল হয়। আবার কেহ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে জোর গলায় বলতেন আজানীয় অশ্ব- দর্শনেই মঙ্গল সম্ভব।

আবার এক শ্রেণীর মানুষের মতে কিছু বিশেষ ধ্বনি-শ্রবণে মঙ্গল হয়। কিছু মানুষের মতে সকালে উঠেই বা যাত্রারম্ভে যদি কিছু বিশেষ গন্ধের আঘ্রাণ নেওয়া হয় বা পাওয়া যায় তা হলে মঙ্গল হয়। অপর কিছু মানুষের মতে কিছু বিশেষ রসের আস্বাদন মঙ্গলাবহ। বিবাদ এতেও ক্ষান্ত হয় নি। কেহ মনে করেন কিছু বিশেষ দ্রব্য বা ধাতু স্পর্শে সম্ভাব্য আপদ-বিপদ দুরীভূত হয়। অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়।

এত মত-মতান্তরের জালে মানুষ আষ্টে পৃষ্টে আবদ্ধ হয়। পালবদ্ধ মাছের ন্যায় পাশ-মুক্তির প্রয়াসে তারা ছট্ ফট্ করতে থাকে। এ সমস্যা ক্রমশ বিকটতর হয়ে সমগ্র জম্বুদ্বীপের মানুষের মধ্যে ছেয়ে যায়। মনুষ্য-লোকে এ সমস্যার সমাধান না হওয়ায় মানব জাতির রক্ষাকারী ভূমিবাসী দেবতা ও অন্তরীক্ষবাসী দেবতারাও চিন্তিত হন। শেষে ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মগণও এতে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এভাবে

দেব-মানব-ব্রহ্মা সকলে বারটি বছর কালাতিপাত করেন। সর্বত্র এক কোলাহলের সৃষ্টি হয়। পালি সাহিত্যে একে মঙ্গল কোলাহল বলা হয়েছে। কোথাও কোনও সঠিক সমাধান না পেয়ে একবার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকের দেবতাগণ একত্রিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হন। তাঁর সম্মুখে এ সমস্যার সমাধান জানতে চাইলে তিনি জানতে চান, তাঁরা কি এর পূর্বে এ সমস্যার সমাধানার্থে তথাগত বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলেন? 'যান নি'- জানতে পেরে তিনি তাঁদেরকে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থানরত ভগবান বুদ্ধের কাছে যাবার পরামর্শ দেন।

একদিন গভীর রাতে তিনি দেবতাদের সাথে নিয়ে কেবলমাত্র জেতবন আলোকিত করে ভগবান বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হন। ভগবানকে বন্দনা করেন। এরপর এক দেবতাকে দেব-মানব-ব্রহ্মার হয়ে 'মঙ্গল কিসে হয়?' প্রশ্নটি রাখার আদেশ দেন। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে ঐ দেবতা এর সমাধান জানতে চেয়ে শাস্তাকে প্রশ্নটি করেন। তার প্রশ্নের উত্তরে শাস্তা দেবমানব ব্রহ্মার হিতার্থে ও সুখার্থে আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল-কর্ম-সূচক এ মঙ্গল-সূত্রের আবৃত্তি করেন।

এ সূত্রের গহন অধ্যয়নে তথাগত বুদ্ধ যে লোক-পরম্পরা বা শ্রুতি-পরম্পরাগত উপরোক্ত নিমিত্ত (লক্ষণ) আদিকে কোন প্রকারের গুরুত্ব দিতেন না এবং আত্মপর কল্যাণকারী কর্মকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন তা অতি স্পষ্ট হয়ে যায়।

এ সূত্রে উল্লিখিত মঙ্গল কর্মসমূহের পালনে, আচরণে ও সম্পাদনে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে মঙ্গলময় করে তুলতে সমর্থ হয়। বুদ্ধ আশ্বাসন দিয়ে বলেন--- এ আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল কর্ম সম্পাদন করেন এমন ব্যক্তি যেখানেই যাক

না কেন, নির্ভীক চিত্তে স্বস্তিযুক্ত হয়ে অবস্থান করেন। দুঃখময় সংসার-সাগরও উত্তীর্ণ হয়ে নির্বাণের অর্থাৎ পরম মঙ্গলময় স্মৃতির অধিকারী হবেন তিনি।

বৌদ্ধ সমাজের যে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আবশ্যকভাবে এ সূত্র পাঠের পরম্পরা রয়েছে।

এ সুত্তটি সুত্তনিপাতেও হুবহু দৃষ্ট হয়। তবে এটি সেখানে **'মহামঙ্গল-সুত্ত'** নামে সমাবিষ্ট হয়েছে।

৬। রতন-সুত্ত

এটি এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ষষ্টম উপদেশ ও তৃতীয় সূত্রের নাম। এ সূত্রের প্রসঙ্গ-কথা জানতে হলে জিজ্ঞাসু জনকে এর অর্থকথার পাতা উল্টোতে হয়। অর্থকথায় উল্লেখ রয়েছে একবার বুদ্ধ রাজগৃহে বর্ষাবাস যাপন করছিলেন। ঐ সময় বৈশালী খরাগ্রস্থ হয়। খাদ্যান্নের অভাবে বৈশালীবাসীর অধিকাংশ মারা যায়। অবশেষ প্রায় সবও কোন না কোন কারণে আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হন। বহু পশু-সম্পত্তির বিনাশ ঘটে। যেখানে সেখানে মানুষ ও পশুর পঁচা শরীর হতে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। দুর্গন্ধের আকর্ষণে ও খাদ্যান্ন সংগ্রহে বৈশালীতে বহু ভুত, প্রেত ও যক্ষের আবির্ভাব ঘটে। এদের উৎপাতেও বৈশালীবাসী ভীতত্র্যস্ত থাকতো।

বৈশালীবাসীর অনুরোধে বৈশালীর তৎকালীন শাসকগণ সমস্যার সমাধানার্থে উপায় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে এক মহতী জনসভার

আহ্বান করেন। জনসভায় দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে বুদ্ধের মহান ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে ও প্রভাবে এ ভয়াবহ পরিস্থিতির সমাধানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাথে বৈশালীবাসীর পক্ষে মগধরাজ বিম্বিসারের নিকট তাঁর বন্ধু মহালীকে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যাতে সম্রাট বিম্বিসার বুদ্ধকে বৈশালী এসে তাঁর মহাকরুণা অভিবর্ষণ করেন। সিদ্ধান্তানুসারে বিম্বিসার সকাশে মহালী এলে বিম্বিসার তাঁকে বেণুবন বিহারে বুদ্ধের নিকট নিয়ে যান। মহালীর মুখে বৈশালীবাসীর দুরাবস্থার কথা শুনে শাস্তা বৈশালী গমনের প্রতিশ্রুতি দেন। সম্মতি পেয়ে উভয় রাজ্যের প্রশাসক ও নাগরিকগণ সানন্দে বুদ্ধের বৈশালী গমনাগমন মার্গ প্রশস্ত ও অলঙ্কৃত করেন।

বৈশালী পৌঁছার পর সন্ধ্যায় আনন্দকে ডেকে শাস্তা রত্ন-সূত্র শোনান আর বৈশালীর তিন দেওয়ালের মাঝে ভ্রমণ করে ভিক্ষু-সংঘের মাধ্যমে ঐ রত্ন-সুত্রের আবৃত্তি করার আদেশ দেন। সে রাত অবিরাম তিন যাম রত্ন-সূত্র আবৃত্তি করা হয়। এর সুপরিণাম স্বরূপ আশ্চর্য-জনকভাবে সমগ্র বৈশালীতে বৃষ্টি হয়। মহাবৃষ্টিতে বৈশালীর সব দুষিত তত্ত্ব ধুয়ে মুছে গঙ্গায় প্রবাহিত হয়। বৈশালী ও বৈশালীবাসী পূর্ণত রোগ ও প্রেতভয় হতে মুক্ত হয়। এর পর বৈশালীবাসীকে সমবেত করিয়ে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘ ক্রমান্বয়ে সাতদিন এ রত্ন-সূত্র (পরিত্রাণ) আবৃত্তি করেন। আশী হাজার শ্রোতাকে সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করে ভগবান বুদ্ধ সশিষ্য বৈশালী হতে প্রস্থান করেন। স্থবিরবাদী পরম্পরানুসারে এ সূত্রের পঠন-পাঠন বড়ই শ্রদ্ধা সহকারে করা হয়। আপদ-বিপদ হতে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে ভিক্ষু-সংঘের মাধ্যমে এর আবৃত্তি করানো হয়।

৭। তিরোকুড্ড-সুত্ত

এ গ্রন্থের সংকলিত নয়টি উপদেশের সপ্তম উপদেশ ও তৃতীয় সূত্রের নাম **'তিরোকুড্ড-সুত্ত'** এর শাব্দিক অর্থ দেওয়ালের ওপারের (অপেক্ষারত প্রেত) কথা।

এ সূত্রের অধ্যয়নে এর পূর্ব প্রসঙ্গকথা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয় না। এ ব্যাপারে এর অর্থকথার সাহায্য নিতে হয়।

অর্থকথানুসারে এ সুত্রটি মগধরাজ বিম্বিসারের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রাসাদেই বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট হয়েছিল। এর বিস্তৃত বিবরণ মগধরাজ বিম্বিসারের মাধ্যমে জ্ঞাতি প্রেতাত্মীয়গণের উদ্দেশ্যে পুণ্যদানের কথাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে।

৮। নিধিকণ্ড-সুত্ত

এটি ক্ষুদ্রকপাঠের অষ্টম পাঠ ও চতুর্থ সূত্র।

ভগবান বুদ্ধ একবার শ্রাবস্তীর এক মহাধনী, মহাশ্রেষ্ঠী ও মহাভোগী উপাসকের বাড়ীতে বিশাল ভিক্ষু-সংঘ পরিবৃত হয়ে অন্নগ্রহণ করছিলেন। ঐ শ্রদ্ধাবান উপাসক স্বহস্তে পরিবেশন করছিলেন।

ঐ সময় কোন কার্যবশত কোশল রাজার কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ঐ মহাশ্রেষ্ঠীকে ডেকে আনার নির্দেশ দিয়ে কোশলরাজ তাঁর এক দূতকে মহাশ্রেষ্ঠীর বাসভবনে পাঠান।

ঐ দূত এসে মহাশ্রেষ্ঠীকে রাজার নির্দেশের কথা জানান। দূতের মুখে রাজার নির্দেশ শুনে মহাশ্রেষ্ঠী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে অন্ন-ব্যঞ্জন

পরিবেশন করতঃ ঐ দূতকে জানান- 'তুমি যাও, আমি (কিছুক্ষণ পর) আসছি। আমি এখন নিধি সঞ্চয়ে ব্যস্ত রয়েছি।'

ভোজনান্তে ঐ শ্রদ্ধাবান উপাসকের শ্রদ্ধোৎকর্ষণের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ **'নিধিং নিধেতি পুরিসো'** আদি গাথা উচ্চারণ করে এ দানজনিত পুণ্যকে পরমার্থ নিধিরূপে ব্যাখ্যা করেন। সংকলন-কালে তাই এ সূত্রের নাম 'নিধিকণ্ড-সূত্র' রাথা হয়।

ঐ ধর্মদেশনা শোনা কালে ঐ উপাসক আরো অনেকের সাথে স্রোতাপত্তি-ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। এর পর তিনি রাজাকে ঐ নিধি সঞ্চয়ের কথা শোনান। রাজা এতে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন এবং তিনবার সাধুবাদ দিয়ে এ কাজের প্রশংসা করেন। পরে রাজাও অনুরূপ দানকার্য সম্পাদন করেন।

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বা অন্য কোন প্রকারে পুণ্য ছিনিয়ে নিয়ে পুণ্যবানকে পুণ্যহীন করা যায় না। এ পুণ্যই এমন এক নিধি যা প্রাণীর ইহ ও পর উভয় জীবনে আপদে বিপদে আশাতীতরূপে সাহায্য ও সুখ প্রদান করে।

একারণে এ সূত্রের শেষভাগে বুদ্ধ ঐ ব্যবসায়ী এবং পরোক্ষভাবে হিতকারী ও সুখকামী সকলকে বিবিধ কুশল কর্ম বা কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে পুণ্যার্জনের পরামর্শ ও প্রেরণা দেন।

এ সুত্রটি পিটক সাহিত্যের অন্য কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। পিটক সাহিত্যের অন্তর্গত সুত্ত-সংগ্রহ নামক গ্রন্থে এর চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম সুত্ররূপে সংকলিত হয়েছে।

বৌদ্ধ পরম্পরায় ভিক্ষু-সংঘের উদ্দেশ্যে দেওয়া দানের অনুমোদনার্থে এ সূত্রটি সাধারণত ভিক্ষু-সংঘ কর্তৃক সশ্রদ্ধ উচ্চারিত হয়।

৯। মেত্ত-সুত্ত

এটি এ গ্রন্থের নবম পাঠ ও পঞ্চম সুত্র।

একবার পাঁচশত ভিক্ষু সমতট হতে হিমালয়ের কোন এক গহন অরণ্যে ধ্যানাভ্যাস হেতু যান। ঐ এলাকা যে পূর্ব হতেই ভুত-প্রেত-যক্ষাদির আবাস-ভূমি ছিল, তা তাঁরা জানতেন না।

একে তো মানুষ, তদুপরি শীলবান ভিক্ষু হওয়ায়, এদের আগমনে ঐ অমানুষদের দিনচরিয়া নানাভাবে বিঘ্নিত হয়। ভিক্ষুগণের শীলময় ভাবনাময় প্রভাব-প্রতিপত্তি অসহনীয় হয়ে পড়ায় ভুত-প্রেত-যক্ষগণ ঐ ভিক্ষুগণের ধ্যানাভ্যাসকালে নানাভাবে ভয়ানক উৎপাত সৃষ্টি করতে থাকে। ঐ উৎপাত রোধ করার কোন উপায় ভেবে না পেয়ে তাঁরা (ভিক্ষুগণ) ঐ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় মহান গুরু ভগবান বুদ্ধের উপদেশ লাভার্থে ঐ ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তী আসেন। উপদেশপ্রার্থী হলে সুগত বুদ্ধ এ মৈত্রী-সূত্র শুনিয়ে পুন তাদেরকে ঐ স্থানে গিয়ে সর্বজীবের প্রতি অসীম মৈত্রী চিত্ত প্রসারপূর্বক ধ্যানাভ্যাসের প্রেরণা ও পরামর্শ দেন।

প্রেরণামূলক উপদেশ পেয়ে তাঁরা পুন ঐ স্থানে উপস্থিত হন এবং মৈত্রী চিত্ত প্রসারপূর্বক ধ্যানাভ্যাসে রত হন। এবারের ধ্যানাভ্যাসের প্রারম্ভিক পর্যায়েও ঐ ভূত-প্রেত-যক্ষগণ পুন উৎপাত সৃষ্টির প্রয়াস করে। তবে এবার ভিক্ষুগণের বিশুদ্ধ ও অসীম মৈত্রী চিত্তের সুপরিণামে তাদের আক্রমন ক্রমান্বয়ে বিফল হয়। এর কারণ অনুসন্ধানের পর তাঁরা জানতে পারেন যে ঐ ভিক্ষুগণের মনে তাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাব নেই। বরং তাঁরা তাদের হিতকামী, সুখকামী ও মঙ্গলাকাঙ্খী। এতে ওদের মনে ভিক্ষুগণের প্রতি যে বিদ্বেষভাব ছিল তা হ্রাস পেতে থাকে এবং তার পরিবর্তে মৈত্রী ও মুদিতাভাব

সঞ্চারিত হয়। পুণ্যাকাঙ্খী কিছু সংখ্যক অমানুষ স্বেচ্ছায় ঐ ভিক্ষুগণের সংরক্ষার ভার গ্রহণ করে। ওদের আর কিছু অন্য ভিক্ষুগণের মুক্তি-মার্গ প্রশস্ত করত অন্যত্র চলে যান।

মৈত্রী **(মেত্ত)** প্রাণীর মানস-জগতে (চিত্তে) ক্রিয়াশীল এক কুশল প্রবৃত্তির (চৈতসিকের) নাম। ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতাদি মৈত্রীর বিপরীত চৈতসিকের নাম। অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা মানুষের মনে মৈত্রী ভাব অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও অজ্ঞতার কারণে স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সাধারণত এ মৈত্রীভাব কেবল নিকটবর্তী আপন প্রিয়জনের মঙ্গল-কামনায় প্রসারিত হয়। শত্রুর প্রতি মৈত্রীভাব প্রসারণের কথা তো দুরে থাকুক, এমন কি অজানা অচেনা মানুষের প্রতিও এর প্রসার হয় না। অথচ শত্রুকে মিত্রে পরিণত করাই মৈত্রীর প্রধান লক্ষণ। কিন্তু অজ্ঞতা ও অনভ্যাসের দরুণ মানুষ এ অসীম গুণসম্পন্ন মৈত্রীর অধিকারী হতে পারে না। শত্রুর প্রতি বিদ্যমান বিদ্বেষ ভাবের পরিপূর্ণ বিনাশেই অসীম মৈত্রী ভাবের উদয় হয়। এ এক অতীব দুষ্কর কার্য। বোধিসত্ত্বগণের পক্ষেই তার পূর্তি সম্ভব।

এ গ্রন্থের মৈত্রী-সূত্রে মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধকে মৈত্রীভাব প্রসারণের আনুক্রমিক ক্ষেত্র সর্ম্পকে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ও সহজবোধ্য উপমায় নির্দেশ দিতে দেখা যায়। **'মেত্ত-সুত্ত'** হতে উদ্ধৃত বহুচর্চিত নিম্নলিখিত গাথায় মৈত্রী- ভাব জাগরণের বীজমন্ত্র নিহিত রয়েছে--

"মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে,
এবম্পি সব্ব ভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।"

গাথার সারার্থ এরূপঃ-

"এক মা, তার নিজ এবং একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষার্থে, যে অকৃত্রিম স্নেহ বর্ষণ করত নিজ আয়ুদান করে বা তা করতে উদ্যত হয়, শান্ত পদ (নির্বান) লাভেচ্ছুক এক সাধককেও ভেদাভেদ নির্বিশেষে বিশ্বের সব প্রাণীকে নিজ সন্তান জ্ঞানে, তাদের হিতার্থে সুখার্থেও মৈত্রী অভিবর্ষণ করতে হয়।"

উপরোক্ত গাথায় যে কেবল মৈত্রী-সূত্রের সার নিহিত রয়েছে, তা নয়। সমগ্র ত্রিপিটকে সংরক্ষিত অমিত অমৃততুল্য বুদ্ধবাণীর সার সুগন্ধির আঘ্রাণও এতে পাওয়া যায়।

এর মাধ্যমে মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধের মাতৃবৎ বিশালতম হৃদয়েরও পরিচয় মেলে। বিদ্বেষভাব উন্মুলনের মাধ্যমে অপরিমিত মৈত্রী ভাবাপন্ন হওয়ার লাভ অনেক। তবে দশটি সুপরিণামের কথা বারবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিবিধ সূত্রে এবং বিশেষ করে **"মেত্তানিসংস-সুত্তে"** বুদ্ধ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে।

পরম্পরামতে এ সূত্রটিকে পরিত্রাণ সূত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়।

গ্রন্থের নাম-করণের সার্থকতা

গ্রন্থের নামকরণ অনেক সময় এর আদি বা মধ্য বা অন্তে আগত (অন্তস্থ) পাঠ্য বিষয় বা পাঠসমূহের আকার, বিষয় বা পাত্রকে গুরুত্ব দিয়ে করা হয়ে থাকে।

এ গ্রন্থের অন্তর্গত নয়টি পাঠের মধ্যে প্রথম চারটি পাঠ অত্যধিক ছোট ও অপর পাঁচটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকারের। এ পাঁচটি পূর্বের চারটি পাঠ

অপেক্ষা দীর্ঘাকারের হলেও 'সূত্র-পিটকের দীর্ঘ-নিকায়, মধ্যম-নিকায়াদিতে আগত অধিকাংশ সূত্রের আকারের তুলনায় অনেক ছোট।

আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, এ গ্রন্থের সংকলক প্রারম্ভিক চারটি পাঠের আকারকে দৃষ্টিতে রেখেই "খুদ্দক-পাঠ" নামকরণ করেছেন।

এছাড়া এ নামকরণের আরো কারণ রয়েছে তা হল, **সরণত্তয়, দসসিক্খাপদ, কুমারপঞ্হা** সূত্রগুলো মূলত ছোট শিশু রাহুল ও সোপাকের দীক্ষা উপলক্ষে উপদিষ্ট হয়েছিল। ছোটদের যোগ্য পাঠ **(খুদ্দকানং সামণেরানং পাঠা)** থাকা বিধায় একে 'খুদ্দকপাঠ' নাম দেওয়া হয়েছে।

সবদিক থেকে বিচার করলে গ্রন্থের এ নামকরণের যথার্থতা রয়েছে। এ নামকরণের মাধ্যমে গ্রন্থের বিষয়বস্তু আকার, গ্রন্থ সংকলনের মূল উদ্দেশ্যাদি সবই এক সাথে দ্যোতিত হয়।

ভাষা ও শৈলী:-

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও প্রব্রজ্যিত কচিকাঁচা বয়সের শ্রামণেরদেরকে ভগবান বুদ্ধের ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানই এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

একারণে এতে এমন পাঠসমূহের সংকলন করা হয়েছে যার বিষয়, ভাষা ও শৈলী বুদ্ধের অন্য উপদেশাবলীতে প্রযুক্ত বিষয়, ভাষা ও শৈলী অপেক্ষা সরলতর।

তবে তুলনাত্মক অধ্যয়নের পর মন্তব্য করা যেতে পারে যে রতন-সুত্ত,

তিরোকুড্ড-সুত্ত ও নিধিকণ্ড-সুত্তে প্রযুক্ত শব্দসমূহ তদ্ভব সংস্কৃত প্রভাবিত। ভাষাও কিছুটা জটিল। ছন্দবদ্ধ গাথায় রচিত।

মাহাত্ম্যঃ-

ক্ষুদ্রক-পাঠের পাঠসমূহের অধ্যয়নে মনে হয় পাঠগুলি এমন এক সুপরিকল্পিতক্রমে সাজানো হয়েছে যাতে পাঠক প্রত্যেকটি পাঠের পঠনপাঠনের সাথে বৌদ্ধসাহিত্য ধর্ম ও দর্শনের গভীর হতে গভীরতর স্তরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

গ্রন্থকারঃ-

কারণ ছাড়া কোন এক ঘটনার ঘটিত হবার সম্ভাবনা যেমন কেবল হাস্যস্পদই নয়, অসম্ভবও বটে। এ দৃষ্টিতে 'ক্ষুদ্রক- পাঠ গ্রন্থেরও গ্রন্থকার কে?' প্রশ্নটি মোটেই অযৌক্তিক নয়।

তথাগত বুদ্ধ তাঁর উপদেশসমূহের কোনটি স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করে যান নি। তাঁর মহাপরিনির্বাণের পর আয়োজিত প্রথম সঙ্গীতিতে সর্বপ্রথম এসবের সংকলন হয়েছে। পরবর্তী সঙ্গীতিসমূহে প্রথম সঙ্গীতিতে সংকলিত বুদ্ধবচনের মূলরূপে সংকলিত প্রয়োজনে সম্মার্জিত ও সম্বর্দ্ধিত হয়েছে মাত্র। বুদ্ধবাণীর অঙ্গ বহির্ভূত নতুন কোন বিষয় পিটকে সংযোজিত হয় নি। একারণে পিটকের অন্তর্ভুক্ত কোন গ্রন্থে কোন গ্রন্থকারের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এ দৃষ্টিতে ত্রিপিটক বা এর অন্তর্ভুক্ত অন্য সব গ্রন্থের ন্যায় খুদ্দকপাঠ (ক্ষুদ্রক পাঠ) গ্রন্থের গ্রন্থকার বুদ্ধ স্বয়ং বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না। তবে বুদ্ধের জীবদ্দশায় যে এ নয়টি পাঠের সংকলন ক্ষুদ্রক-পাঠ গ্রন্থের আকারে হয়নি তা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। এর গ্রন্থের পাঠসমূহের সংকলনের দায়িত্ব কার বা কাদের উপর ছিল তা স্পষ্ট বিবরণ পিটকের কোথাও নেই।

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

খুদ্দক-পাঠো

পঠমো পাঠো

সরণত্তয়ং

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।।

দুতিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
দুতিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
দুতিয়ম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি।।

ততিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ততিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
ততিয়ম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি।।

ঐ ভগবান অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধকে নমস্কার

ক্ষুদ্রকপাঠ

প্রথম পাঠ

শরণত্রয়

বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।
ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।
সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয় বারও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।
দ্বিতীয় বারও ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।
দ্বিতীয় বারও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি।

তৃতীয় বারও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।
তৃতীয় বারও ধর্মেও শরণ গ্রহণ করছি।
তৃতীয় বারও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি।

দুতিয়ো পাঠো

দসসিক্‌খাপদং

১। **পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।**

২। **অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।**

৩। **অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।**

৪। **মুসাবাদা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।**

৫। **সুরামেরেয়মজ্জপমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।**

৬। **বিকালভোজনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।**

৭। **নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূক-দস্‌সনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।**

৮। **মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূসনট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।**

৯। **উচ্চাসয়ন-মহাসয়না বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।**

১০। **জাত-রূপ-রজত-পটিগ্গহণা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।**

দ্বিতীয় পাঠ

দশশিক্ষাপদ

১। প্রাণীহত্যা (-জনিত পাপকর্ম) হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

২। অপ্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ (-জনিত চৌর্য কর্ম) হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৩। অব্রহ্মচর্য (ব্যভিচারজনিত কর্ম) হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৪। মিথ্যাবাক্য (প্রয়োগজনিত কর্ম) হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৫। সুরা-মৈর্য-মদ্য-সেবন ও প্রমাদকর স্থান গমন (-জনিত কর্ম) হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৬। বিকাল-ভোজন গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৭। নাচ-গান বাদ্যবাজনা বাজানো ও প্রমাদকর অনুষ্ঠান দর্শন (-জনিত কর্ম) হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৮। মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূষণ-জনিত কর্ম হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৯। উচ্চশয়ন ও মহাশয়ন গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

১০। সোনা-রূপায় তৈরী দ্রব্য গ্রহণ (-জনিত কর্ম) হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

ততিয়ো পাঠো

দ্বত্তিংসাকারো

অত্থি ইমস্মিং কায়ে--

কেসা লোমা নখা দন্তা তচো মংসং নহারূ অট্ঠি অট্ঠিমিঞ্জং বক্কং হদয়ং যকনং কিলোমকং পিহকং পপ্ফাসং অন্তং অন্ত-গুণং উদরিয়ং করীসং মত্থলুঙ্গং পিত্তং সেম্হং পুব্বো লোহিতং সেদো মেদো অস্সু বসা খেলো সিঙ্ঘাণিকা লসিকা মুত্ত' ন্তি।

তৃতীয় পাঠ

বত্রিশ প্রকার (অশুভ তত্ত্ব)

এ শরীরে আছে--

কেশ, লোম, নখ, দাঁত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থি-মজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, মল, মগজ (ঘিলু), পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু, শিকনি, লসিকা, মূত্র।

চতুত্থো পাঠো
কুমারপঞ্হা

১। একং নাম কি?
সব্বে সত্তা আহারট্ঠিতিকা।

২। দ্বে নাম কিং?
নামং চ রূপং চ।

৩। তীণি নাম কি?
তিস্সো বেদনা।

৪। চত্তারি নাম কি?
চত্তারি অরিয় সচ্চানি।

৫। পঞ্চ নাম কি?
পঞ্চুপাদানক্খন্ধা।

৬। ছ নাম কি?
ছ অজ্ঝত্তিকানি আয়তনানি।

৭। সত্ত নাম কি?
সত্ত বোজ্ঝঙ্গা।

৮। অট্ঠ নাম কি?
অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো।

৯। নব নাম কি?
নব সত্তাবাসা।

১০। দস নাম কিং।
দসহঙ্গেহি সমন্নাগতো অরহা'তি বুচ্চতীতি।

চতুর্থ পাঠ

কুমার-প্রশ্ন

১। এক বলতে কি বোঝায়?
সকল প্রাণী আহারে নির্ভরশীল।

২। দুই বলতে কি বোঝায়?
নাম ও রূপ।

৩। তিন বলতে কি বোঝায়?
তিন প্রকার বেদনা।

৪। চার বলতে কি বোঝায়?
চার প্রকার আর্য সত্য।

৫। পাঁচ বলতে কি বোঝায়?
স্কন্ধ সমূহের পাঁচ প্রকার উপাদান প্রতি।

৬। ছয় বলতে কি বোঝায়?
ছয় প্রকার আন্তরিক আয়তন।

৭। সাত বলতে কি বোঝায়?
সাত প্রকার বোধ্যঙ্গ।

৮। আট বলতে কি বোঝায়?
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

৯। নয় বলতে কি বোঝায়?
প্রাণীগণের নয় প্রকারের আবাস।

১০। দশ বলতে কি বোঝায়?
অরহত্বগণের দশ প্রকারের গুণ (অঙ্গ)।

পঞ্চমো পাঠো

মঙ্গল-সুত্তং

এবং মে সুতং। একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। অথ খো অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায় রত্তিয়া অভিক্কন্তবণ্ণা কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায় অজ্ঝাভাসি--

(১) বহু দেবা মনুস্সা চ, মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং,
আকঙ্খমানা সোত্থানং, ব্রুহি মঙ্গলমুত্তমং।

(ভগবতা দেসিতং মঙ্গলকম্মং)

১। অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানং চ সেবনা,
পূজা চ পূজনীয়ানং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

২। পতিরূপদেসবাসো চ, পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা,
অত্তসম্মাপণিধি চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৩। বহু সচ্চং চ সিপ্পং চ, বিনয়ো চ সুসিক্খিতো,
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৪। মাতাপিতুউপট্ঠানং, পুত্তদারস্স সঙ্গহো,
অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৫। দানং চ ধম্মচরিয়া চ, ঞাতকানং চ সঙ্গহো,
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৬। আরতি বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সংয়মো,
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৭। গারবো চ নিবাতো চ, সন্তুট্ঠি চ কতঞ্ঞুতা,
কালেন ধম্মসবনং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৮। খন্তী চ সোবচস্সতা, সমণানং চ দস্সনং,
কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৯। তপো চ ব্রহ্মচরিয়ং চ, অরিয়সচ্চান দস্সনং,
নিব্বাণসচ্ছিকিরিয়া চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

১০। ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি, চিত্তং যস্স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং খেমং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

১১। এতাদিসানি কত্বান, সব্বত্থমপরাজিতা,
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি, তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি।।

পঞ্চম পাঠ

মঙ্গল-সূত্র

আমার মাধ্যমে এমন শোনা গেছে। এক সময় ভগবান (বুদ্ধ) শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথ-পিণ্ডদের তৈরী আরামে বিহার করছিলেন। তখন এক দেবতা রাত্রি শেষে (প্রত্যুষকালে) অসামান্য দিব্যপ্রভায় কেবলমাত্র জেতবনকে আলোকিত করে যেখানে ভগবান (বুদ্ধ) অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হন। (সেখানে) উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক পাশে দাঁড়ান। এক পাশে দাঁড়িয়ে ঐ দেবতা (নিম্নলিখিত) গাথাকারে ভগবানকে বললেন (প্রশ্ন করলেন)--

(১) মঙ্গল কিসে হয়? এ ব্যাপারে (স্বস্তিকামী) বহু মানুষ এমন কি দেবগণও চিন্তান্বিত আছেন। দয়া করে, উত্তম মঙ্গল কি (কিসে হয়)? তা বলুন।

ভগবান (বুদ্ধও) নিম্নলিখিত গাথায় (উত্তর দিয়ে) বলেন-

১। মূর্খগণের সংশ্রবে না থাকা, পণ্ডিতগণের সাথে থাকা, পূজনীয়গণের পূজা করা- এ(সব)ই উত্তম মঙ্গল।

২। অনুকূল দেশে বাস করা, পূর্বের কৃত পুণ্য কর্ম (-এর প্রভাবে বর্তমানে সুখ লাভ করছে) স্মরণ করা, এবং নিজেকে সম্যক্ মার্গে নিয়োজিত করা- এ(সব)ই উত্তম মঙ্গল।

৩। বহু সত্যের (জ্ঞানের) জ্ঞাতা হওয়া, শিল্প শেখা, বিনয়ী হওয়া, সুশিক্ষিত হওয়া, মৃদু (মধুর) ভাষী হওয়া- এ(সব)ই উত্তম মঙ্গল।

৪। মাতা-পিতার সেবা-শুশ্রুষা করা, স্ত্রী-পুত্রের লালন-পালন (সংরক্ষণ) করা, কুলের হিতকারী (অনুকুল) কর্ম করা- এ (সব)ই উত্তম মঙ্গল।

৫। দান দেওয়া, ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতীগণকে একত্রিত (তাদের সংরক্ষণ) করা, অনিন্দনীয় কর্ম করা- এ(সব)ই উত্তম মঙ্গল।

৬। পাপে রতি না রাখা, পাপ হতে দূরে থাকা, মদ্যপানে সংযমী হওয়া, ধর্মাচরণে অপ্রমত্ত থাকা- এ(সব)ই উত্তম মঙ্গল।

৭। গর্ব বোধ করা, নিরভিমানী হওয়া, যথালাভে সন্তুষ্ট হওয়া,

(উপকারীর প্রতি) কৃতজ্ঞ থাকা, সময়ে ধর্মশ্রবণ করা- এ(সব)ই উত্তম মঙ্গল।

৮। ক্ষমাশীল হওয়া, আজ্ঞাকারী হওয়া, শ্রমণগণের দর্শন লাভ করা, কালে ধর্ম-দেশনা করা- এ(সব)ই উত্তম মঙ্গল।

৯। তপ করা, ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করা, আর্য সত্য দর্শন করা এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করা- এ(সব)ই উত্তম মঙ্গল।

১০। লোকধর্মে (লাভ, অলাভ, যশ, অপযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ) চিত্তকে বিচলিত হতে না দেওয়া, শোক-মুক্ত রাখা, রজ-রহিত রাখা ও শান্ত রাখা -এ (সব)ই উত্তম মঙ্গল।

১১। যারা এসব (উত্তম মঙ্গল-কর্ম সম্পাদন) করেন তারা (যেখানেই অবস্থান করুন না কেন) সর্বত্র অপরাজিত থাকেন। সর্বত্র স্বস্তির সাথে (নিশ্চিন্তে) থাকেন। এমন মঙ্গল-কর্ম সম্পাদন করাই তাদের (দেবমনুষ্যগণের জন্যে) উত্তম মঙ্গল।

ছট্ঠো পাঠো

রতন-সুত্তং

১। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে।
সব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্তু,
অথো পি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং।।

২। তস্মা হি ভূতা নিসামেথ সব্বে,
মেত্তং করোথ মানুসিয়া পজায়।
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং,
তস্মা হি নে রক্খথ অপ্পমত্তা।।

৩। যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা,
সগ্গেসু বা যং রতনং পণীতং।
ন নো সমং অত্থি তথাগতেন,
ইদং পি বুদ্ধে রতনং পণীতং।
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।।

৪। খয়ং বিরাগং অমতং পণীতং,
যদজ্ঝগা সক্যমুনী সমাহিতো।
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি,
ইদং পি ধম্মে রতনং পণীতং।
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।।

৫। যং বুদ্ধসেট্ঠো পরিবণ্ণয়ী সুচিং,
সমাধিমানন্তরিকঞ্ঞমাহু।
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি,

ইদং পি ধম্মে রতনং পণীতং।
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।।

৬। যে পুগ্গলা অট্ঠসতং পসত্থা,
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি।
তে দক্খিণেয়্যা সুগতস্স সাবকা,
এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি।
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং।
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।।

৭। যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্হেন,
নিক্কামিনো গোতমসাসনম্হি।
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয়্হ,
লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা।
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।।

৮। যথিন্দখীলো পঠবিস্সিতো সিয়া,
চতুব্ভি বাতেহি অসম্পকম্পিয়ো।
তথূপমং সপ্পুরিসং বদামি,
যো অরিয়সচ্চানি অবেচ্চ পস্সতি।
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং।
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।।

৯। যে অরিয়সচ্চানি বিভাবয়ন্তি,
গম্ভীরপঞ্ঞেন সুদেসিতানি।
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসং পমত্তা,
ন তে ভবং অট্ঠমমাদিয়ন্তি।

ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং।
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।।

১০। সহাবস্‌স দস্‌সনসম্পদায়,
তয়স্‌সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি।
সক্কায়দিট্‌ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ,
সীলব্বতং বা পি যদত্থি কিঞ্চি।
চতূহ'পায়েহি চ বিপ্পমুত্তো,
ছ চাভিট্‌ঠানানি অভব্বো কাতুং।
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।।

১১। কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং,
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা।
অভব্বো সো তস্‌স পটিচ্ছদায়,
অভব্বতা দিট্‌ঠপদস্‌স বুত্তা,
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং।
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।।

১২। বনপ্পগুম্বে যথা ফুস্‌সিতগ্গে,
গিম্‌হানমাসে পঠমস্মিং গিম্‌হে।
তথূপমং ধম্মবরং অদেসয়ি,
নিব্বাণগামিং পরমং হিতায়।
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং।
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।।

১৩। বরো বরঞ্ঞূ বরদো বরাহরো,
অনুত্তরং ধম্মবরং অদেসয়ি।

ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং।
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।।

১৪। খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং,
বিরত্তচিত্তায়তিকে ভবস্মিং।
তে খীণবীজা অবিরুলি্হছন্দা,
নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপো,
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং।
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।।

১৫। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভূম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেবমনুস্স পূজিতং।
বুদ্ধং নমস্সাম সুবত্থি হোতু।।

১৬। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দেবমনুস্স পূজিতং,
ধম্মং নমস্সাম সুবত্থি হোতু।।

১৭। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভূম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দেবমনুস্সপূজিতং,
সঙ্ঘং নমস্সাম সুবত্থি হোতূ'তি।।

ষষ্ঠ পাঠ

রত্ন-সূত্র

১। এই সময় পৃথিবী বা আকাশবাসী যে সব প্রাণী এখানে উপস্থিত আছেন আপনারা সবাই প্রফুল্লচিত্তে ও আদরের সাথে দেশিত দেশনা শুনুন।

২। আপনাদের হিতার্থে দিবারাত্রি (পুণ্যদান) দিচ্ছেন। এ কারণে ঐ মানবগণের হিতকামনায় আপনারাও মৈত্রীপরায়ণ তাদের রক্ষা করুন। সদ্ধর্মশ্রবণ বড়ই দুর্লভ ঘটনা। কাজেই আপনারা সবাই মন দিয়ে (স্মৃতি সহকারে) ঐ ধর্মশ্রবণ করুন।

৩। ইহ বা পর লোকে অথবা স্বর্গে যে সব রত্ন রয়েছে, ওসবের কোনটি তথাগতের সমতুল্য নয়। বুদ্ধরত্নে বিদ্যমান শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাবে (আপনাদের সবার) মঙ্গল বা স্বস্তি হউক।

৪। সমাধিরাজ শাক্যমুনি বুদ্ধ (লোভ, দ্বেষ, মোহাদি) ক্লেষ-ক্ষয়কারী ও বৈরাগ্য উৎপাদক শ্রেষ্ঠ নির্বাণামৃত পান করেছেন। এ সত্য বাক্যের প্রভাবে (সবার) স্বস্তি হউক।

৫। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ যে সমাধিকে অনন্তগুণসম্পন্ন সমাধিরূপে প্রশংসা করেছেন, ঐ ধর্মতুল্য নির্বাণের সমান কিছুই (এ সংসারে) নেই। ধর্মে বিদ্যমান এ গুণও রত্নতুল্য। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে (সবার) স্বস্তি হউক।

৬। যে আট প্রকারের পুদ্গল (পুরুষ) বুদ্ধাদি সৎপুরুষ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছেন, তাঁরা মার্গ ও ফল লাভী ভেদে চার জোড়া। ঐ সুগত-শ্রাবকগণ দক্ষিণার যোগ্য পাত্র।

এদেরকে দেওয়া দান মহাফলদায়ক হয়। সংঘে বিদ্যমান এগুণও উত্তম রত্নতুল্য। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে (সবার) স্বস্তি হউক।

৭। যে সব নিষ্কামপুরুষগণ দৃঢ় চিত্তের সাথে বুদ্ধশাসনে স্থিত আছেন, তাঁরা জীবনের পরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়ে যথেচ্ছা অমৃত (নির্বাণ) পান করেন। সংঘে বিদ্যমান এও উত্তম রত্নতুল্য। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে (সবার) স্বস্তি হউক।

৮। নিজ জ্ঞানে চার আর্যসত্য-দর্শন করেছেন এমন সৎপুরুষগণকে মাটিতে সুদৃঢ়ভাবে পোতা ইন্দ্রখীলতুল্য বলে বলি (প্রশংসা করি)। সংঘে বিদ্যমান এগুণও রত্নতুল্য। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে (সবার) স্বস্তি হউক।

৯। গভীর প্রজ্ঞাবান বুদ্ধের দ্বারা সুদেশিত চার আর্যসত্য যাঁরা ভালভাবে চিন্তা করেন, তাঁরা কোন কালে প্রমত্ত হলেও বর্তমান জন্মের পর অষ্টমবার সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না। সংঘে বিদ্যমান এগুণও রত্নতুল্য। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে (সবার) স্বস্তি হউক।

১০। দর্শন-সম্পদ (স্রোতাপত্তিফল) প্রাপ্তির সাথে যাঁদের মানসজগত হতে সৎকায় দৃষ্টি, সংশয়, শীলব্রত-পরামাস নামক তিনটি সংযোজন চিরতরে সমূলে বিনষ্ট হয়। তাঁরা চার অপায় হতে মুক্ত হন আর ছয় প্রকারের (মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অরহন্তাহত্যা, বুদ্ধের রক্তপাত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ধর্ম গ্রহণ জনিত) পাপ কর্ম করা তাদের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সংঘে বিদ্যমান এ গুণও রত্নতুল্য। এ বাক্যের প্রভাবে (সবার) স্বস্তি হউক।

১১। স্রোতাপন্ন আর্যপুরুষগণ কখনও কায়, বাক্য ও মনে পাপকর্ম করেন না। কোন কারণে করে থাকলেও তাঁরা তা গোপন রাখতে পারেন না। কারণ সত্য-দ্রষ্টাগণের পক্ষে তা করা অসম্ভব বলে বলা হয়েছে। সংঘে বিদ্যমান এ গুণও রত্নতুল্য। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে (সবার) স্বস্তি হউক।

১২। গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাসে বনের বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদিতে ফুল ফুটলে সমগ্র বন যেমন সুশোভিত হয়, ঠিক তেমনি পরম হিতকারী (শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাময়) ধর্মরত্নের প্রচার ভগবান বুদ্ধ করেছেন।

১৩। বর (শ্রেষ্ঠ), বরজ্ঞ (নির্বাণজ্ঞ), ও বরদ (বিমুক্তি ও শান্তি দাতা) শ্রেষ্ঠ মার্গলাভী ভগবান বুদ্ধ অনুত্তর নৈর্বাণিক ধর্ম প্রচার করেছেন। বুদ্ধে বিদ্যমান এ গুণও রত্নতুল্য। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে (সবার) স্বস্তি হউক।

১৪। ঐ অরহত্বগণের চিত্ত রাগরহিত হওয়ায় পুরানো পাপ-প্রবৃত্তি ক্ষীণ (ক্ষয় প্রাপ্ত) হয়, নতুন পাপ-প্রবৃত্তির উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না, পুনর্জন্ম গ্রহণের ছন্দও (তাঁদের চিত্তে) উৎপন্ন হয় না। কর্মরূপী বীজ পূর্ণত ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় এমন ধীর ব্যক্তিগণ (তেলশূন্য) প্রদীপের ন্যায় নির্বাপিত হন।

১৫। ধর্মদেশনা শেষে দেবরাজ ইন্দ্র বলেন- যেসব দেবগণ, ভূমিবাসী ও আকাশবাসী এখানে উপস্থিত আছেন, আসুন, সকলে মিলে দেবমানবের পূজ্য তথাগত বুদ্ধকে নমস্কার করি। (এই নমস্কারজনিত পুণ্যকর্মের প্রভাবে সবার) স্বস্তি হউক।

১৬। ধর্মদেশনা শেষে দেবরাজ ইন্দ্র বলেন- ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যেসব দেবগণ, এখানে উপস্থিত আছেন, আসুন সকলে মিলে দেবমানবের পূজ্য ধর্মকে নমস্কার করি। (এই নমস্কারজনিত পুণ্য-কর্মের প্রভাবে সবার) স্বস্তি হউক।

১৭। ধর্মদেশনা শেষে দেবরাজ ইন্দ্র বলেন- ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যেসব দেবগণ, এখানে উপস্থিত আছেন, আসুন সকলে মিলে দেবমানবের পূজ্য সঙ্ঘকে নমস্কার করি। (এই নমস্কারজনিত পুণ্যকর্মের প্রভাবে সবার স্বস্তি হউক।

সত্তমো পাঠো

তিরোকুড্ডসুত্তং

১। তিরোকুড্ডেসু তিট্ঠন্তি, সন্ধিসিঙ্ঘাটকেসু চ,
দ্বারবাহাসু তিট্ঠন্তি, আগন্ত্বান সকং ঘরং।

২। পহুতে অন্নপানম্হি খজ্জভোজ্জে উপট্ঠিতে,
ন তেসং কোচি সরতি, সত্তানং কম্মপচ্চয়া।

৩। এবং দদন্তি ঞাতীনং, যে হোন্তি অনুকম্পকা,
সুচিং পণীতং কালেন, কপ্পিয়ং পানভোজনং।

৪। ইদং বো ঞাতীনং হোতু, সুখিতা হোন্তু ঞাতয়ো,
তে চ তত্থ সমাগন্ত্বা, ঞাতিপেতা সমাগতা।

৫। পহুতে অন্নপানম্হি, সক্কচ্চং অনুমোদরে,
চিরং জীবন্তু নো ঞাতী, যেসং হেতু লভামসে।

৬। অম্হাকং চ কতা পূজা, দায়কা চ অনিপ্ফলা,
নহি তত্থ কসী অত্থি, গোরক্খেত্থ ন বিজ্জতি।

৭। বণিজ্জা তাদিসী নত্থি, হিরঞ্ঞেন কয়াক্কয়ং,
ইতো দিন্নেন যাপেন্তি, পেতা কালকতা তহিং।

৮। উন্নমে উদকং বুট্ঠং, যথা নিন্নং পবত্ততি,
এবমেব ইতো দিন্নং, পেতানং উপকপ্পতি।

৯। যথা বারি বহা পূরা, পরিপূরেন্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং, পেতানং উপকপ্পতি।

১০। অদাসি মে অকাসি মে, ঞাতিমিত্তা সখা চ মে,
পেতানং দক্খিণং দজ্জ, পুব্বে কতং অনুস্সরং।

১১। নহি রুণ্ণং বা সোকো বা, যা চঞ্ঞা পরিদেবনা,
ন তং পেতানমত্থায়, এবং তিট্ঠন্তি ঞাতয়ো।

১২। অয়ং চ খো দক্খিণা দিন্না, সংঘম্হি সুপ্পতিট্ঠিতা,
দীঘরত্তং হিতায়স্স, ঠানসো উপকপ্পতি।

১৩। সো ঞাতিধম্মো চ অয়ং নিদস্সিতো,
পেতানং পূজা চ কতা উলারা।
বলং চ ভিক্খুনং অনুপ্পদিন্নং,
তুম্হেহি পুঞ্ঞং পসুতং অনপ্পকন্তি।।

সপ্তম পাঠ

দেওয়ালের পারে (প্রতীক্ষমানদের প্রতি দেওয়া) উপদেশ

১। (প্রেতযোনিতে জন্মেছেন মৃত জ্ঞাতিগণ) নিজের ঘরে বা আত্মীয়ের ঘরে, দেওয়ালের বাইরে, ঘরের কোণে বা দরজার চৌকাঠে ভর করে বা রাস্তার সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন।

২। প্রচুর অন্ন-পানীয় খাদ্য-ভোজ্য দ্রব্যাদি থাকা সত্ত্বেও সত্ত্বগণের (পূর্বকৃত পাপ-) কর্মের কারণে কেহ তাদের স্মরণ করে না।

৩। (মনুষ্যলোকে) যারা অনুকম্পাপরায়ণ আত্মীয়গণ প্রেতাত্মীয়গণের পারলৌকিক হিতার্থে কালে শুদ্ধ ও উত্তম

অন্নপানীয়াদি দান দেন।

৪। 'এ দানজনিত পুণ্য তাদের হউক, এর প্রভাবে তারা দীর্ঘায়ু হউক, তারা সুখী হউক।'- এভাবে পুণ্যদান করা হলে প্রেতাত্মীয়গণ সেখানে দান দেবার স্থলে একত্রিত হন।

৫। সবার অলক্ষ্যে সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রেতাত্মীয়গণ তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পুণ্য আদরের সাথে অনুমোদন করেন। অনুমোদনকালে তারা দাতাগণের হিতকামনা করে বলেন-- যাদের কারণে আমরা প্রচুর অন্নপানীয়াদির মধ্যে থাকা সত্ত্বেও, পেলাম তারা এ প্রভাবে দীর্ঘায়ু হউক।

৬। যাদের কারণে আমরা পূজিত হলাম, ঐ দাতাদের দানকর্ম নিষ্ফল না হউক।

৭। সেখানে (প্রেতলোকে জীবিকোপার্জনের) কৃষিকর্ম নেই, গোপালনও হয় না, তেমন ব্যবসা-বাণিজ্যও নেই, সোনার বিনিময়ে বেচাকেনাও হয় না। এখান (মুনষ্যলোক) হতে প্রদত্ত পুণ্যদানে (পরদত্তুপজীবী) মৃত প্রেতাত্মীয়রা জীবন যাপন করেন।

৮। উঁচু স্থানে পড়া জল যেমন নীচের দিকে প্রবাহিত হয় ঠিক তেমনিভাবে এখান হতে দেওয়া দান প্রেতাত্মীয়গণের জীবনে উৎপন্ন হয় (সুখ প্রদান করে)।

৯। নদীর জল যেমন নীচের দিকে প্রবাহিত হয়ে সাগরকে পরিপূর্ণ করে ঠিক তেমনিভাবে এখান হতে দেওয়া পুণ্যও প্রেতাত্মীয়গণের উপকারে আসে।

১০। '(মনুষ্যলোকে জীবিত থাকাকালে) তাঁরা আমাকে কত কিছু দিয়েছিলেন, কত উপকার করেছিলেন, তাঁরা আমার জ্ঞাতি, মিত্র, সখা'--- এ কৃতজ্ঞতাভাব ব্যক্ত (অনুস্মরণ) করে প্রেতগণের উদ্দেশ্যে (অন্নবস্ত্রাদি) দক্ষিণা দেওয়া উচিত।

১১। মৃতের উদ্দেশ্যে কান্নাকাটি, শোক-বিলাপ করা হলে ওসবের মাধ্যমে মৃতদের কোন প্রকারের হিত সাধিত হয় না। তারা পূর্ববৎ থাকেন।

১২। এই যে দান বা দক্ষিণা দেওয়া হল তা উত্তম পুণ্যক্ষেত্র সংঘে (বীজরূপে) সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এ পুণ্য কালগত জ্ঞাতিগণের দীর্ঘকালীন হিতসাধন করবে। তারা তা তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হয়।

১৩। এভাবে দান-দক্ষিণা দেওয়ার (পুণ্যকর্ম সম্পাদনের) মাধ্যমে জ্ঞাতিধর্ম পালন করা হল। প্রেতাত্মীয়গণকে উত্তমরূপে পূজাও করা হল আর ভিক্ষু-সংঘকেও বল-প্রদান করা হল। সাথে দাতাগণও প্রচুর পুণ্যের অধিকারী হলেন।

অট্ঠমো পাঠো

নিধিকণ্ডসুত্তং

১। নিধিং নিধেতি পুরিসো, গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
অত্থে কিচ্চে সমুপ্পন্নে, অত্থায় মে ভবিস্সতি।

২। রাজতো বা দুরুত্তস্স, চোরতো পীলিতস্স বা,
ইণস্স বা পমোক্খায়, দুব্ভিক্খে আপদাসু বা।
এতদত্থায় লোকস্মিং, নিধি নাম নিধীয়তি।।

৩। তাব সুনিহিতো নিধি, গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
ন সব্বো সব্বদা এব, তস্স তং উপকপ্পতি।

৪। নিধি বা ঠানা চবতি, সঞ্ঞা' বাস্স বিমুয়্হতি,
নাগা বা অপনামেন্তি, যক্খা বা পি হরন্তি নং,
অপ্পিয়া বা পি দায়াদা, উদ্ধরন্তি অপস্সন্তো,
যদা পুঞ্ঞক্খয়ো হোতি, সব্বমেতং বিনস্সতি।

৫। যস্স দানেন সীলেন, সঞ্ঞমেন দমেন চ,
সুনিহিতো, ইত্থিয়া পুরিসস্স বা,
নিধি সুনিহিতো হোতি, ইত্থিয়া পুরিসস্স বা,
চেতিয়ম্হি চ সঙ্ঘে বা পুগ্গলে অতিথীসু বা,
মাতরি পিতরি বাপি, অথো জেট্ঠম্হি ভাতরি।
এসো নিধি সুনিহিতো, অজেয়্যো অনুগামিকো,
পহায় গমনীয়েসু, এতং আদায় গচ্ছতি।

৬। অসাধারণমঞ্ঞেসং, অচোরাহরণো নিধি,
কয়িরাথ ধীরো পুঞ্ঞানি, যো নিধি অনুগামিকো।

৭। এস দেব-মনুস্সানং, সব্বকামদদো নিধি,
যং যদেবাভিপত্থেন্তি, সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

৮। সুবণ্ণতা সুস্সরতা সুসণ্ঠানা সুরূপতা,
আধিপচ্চং পরিবারো, সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

৯। পদেসরজ্জং ইস্সরিয়ং, চক্কবত্তিসুখং পিয়ং,
দেবরজ্জং পি দিব্বেসু, সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

১০। মানুসকা চ সম্পত্তি, দেবলোকে চ যা রতি,
যা চ নিব্বাণসম্পত্তি, সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

১১। মিত্তসম্পদমাগম্ম, যোনিসো বে পয়ুঞ্জতো,
বিজ্জা বিমুত্তি বসীভাবো, সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

১২। পটিসম্ভিদা বিমোক্‌খা চ, যা চ সাবকপারমী,
পচ্চেকবোধি বুদ্ধভূমি, সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

১৩। এবং মহিদ্ধিকা এসা, যদিদং পুঞ্ঞসম্পদা,
তস্মা ধীরা পসংসন্তি, পণ্ডিতা কতপুঞ্ঞতন্তি।

অষ্টম পাঠ

নিধিকণ্ড-সূত্র

১। বিশেষ প্রয়োজনে 'এটি আমার কাজে আসবে'-ভেবে মানুষ মাটির নীচে গভীর গর্তে ধন পুঁতে রাখে।

২। 'রাজার দৌরাত্ম্য, চোরের উপদ্রব, ঋণমুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষ বা অন্য আপদ-বিপদ হতে পরিত্রাণ পাব'-- ভেবে মাটির তলায় (গুপ্ত) ধন পুঁতে রাখে।

৩। এভাবে মাটির গভীর তলায় ঐ গুপ্ত ধন সুনিহিত থাকা সত্ত্বেও সব সময় তার উপকারে আসে না।

৪। পুণ্যক্ষয়ের প্রভাবে হয় ঐ গুপ্তধন তার মূল স্থান হতে চ্যুত হয়, আর না হয় ঐ গুপ্ত ধনের ব্যাপারে মতিভ্রম হয়; হয় তা নাগরাজ কর্তৃক স্থানান্তরিত হয়; আর না হয় যক্ষগণ তা (বলপূর্বক) অপহরণ করেন; আর না হয় কোন অপ্রিয় উত্তরাধিকারী অজান্তে তা উদ্ধার করে। পুণ্যক্ষয়ে সব সম্পত্তি (নিধি) বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৫। দান, শীল, সংযম ও দমের মাধ্যমে স্ত্রী বা পুরুষ যে পুণ্য সঞ্চয় করে সে পুণ্যই প্রকৃত পক্ষে নর-নারীর সুনিহিত নিধি। চৈত্যাদির নির্মাণ ও এর সংস্কার কার্যে, সংঘ-সেবায়, অতিথি-সেবায়, মাতা-পিতা অথবা জ্যেষ্ঠ ভাই-বোনগণের সেবায় স্ত্রী বা পুরুষ যে পুণ্য সঞ্চয় করে তা তাদের সুনিহিত নিধি। এ নিধি প্রকৃত পক্ষে অজেয় নিধি যা ব্যক্তির অনুগামী হয়। (মৃত্যুকালে পর পারে) যাবার সময় সে এ নিধি সাথে নিয়ে যায়।

৬। এ নিধি অসাধারণ নিধি। এর উপর অন্যের অধিকার থাকে না। চোরেও তা চুরি করতে পারে না। হে পণ্ডিত ব্যক্তি, এমন অনুগামী নিধি সঞ্চয় কর।

৭। এ নিধি দেব-মানুষের সব মনোকামনা পূর্ণ করে। তাদের সব বিশেষ আশা-অভিলাষা এ নিধির মাধ্যমে পূর্ণ হয়।

৮। সুন্দর বর্ণ, সুমিষ্ট স্বর, সুন্দর দেহ, সুন্দর রূপ, প্রভাব প্রতিপত্তি, পরিবার সম্পত্তি সবই এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

৯। শুধু তা নয়, এ নিধির প্রভাবে প্রাদেশিক রাজ্য, ঐশ্বর্য, চক্রবর্তী-সুখ, এমন কি দিব্য স্বর্গ-সুখও পাওয়া যায়।

১০। প্রাণীর জীবনে প্রাপ্তব্য মানুষী ও দৈব সুখ-সম্পত্তি, এছাড়া পরম নির্বাণ সম্পত্তি আদি সবই এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

১১। মিত্র-সম্পত্তি লাভ করে যিনি সজ্ঞানে সমাধির অভ্যাস করেন তিনি বিদ্যা, বিমুক্তি ও চিত্ত-বশীভাব সবই এ নিধির মাধ্যমে লাভ করেন।

১২। (চার) প্রতিসম্ভিদা, (আট) বিমোক্ষ, শ্রাবক-পারমী, প্রত্যেক বোধি অথবা বুদ্ধভূমি (সম্যক্ সম্বোধি) সবই এর মাধ্যমে লাভ করা যায়।

১৩। এই পুণ্য-সম্পদ (এমনই) অলৌকিক শক্তিশালী। কাজেই ধীর পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এমন পুণ্য-সম্পদের সম্পাদন করে থাকেন।

নবমো পাঠো

মেত্তসুত্তং

১। করণীয়মত্থকুসলেন, যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজু চ সুজূ চ, সুবচো চস্স মুদু অনতিমানী।

২। সন্তুস্সকো চ সুভরো চ অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ, অপ্পগব্‌ভো কুলেস্বননুগিদ্ধো।

৩। ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি, যেন বিঞ্ঞু পরে উপবদেয্যং,
সুখিনো ব খেমিনো হোন্তু, সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

৪। যে কেচি পাণভূতত্থি, তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে ব মহন্তা, মজ্ঝিমা রস্সকা অনুকত্থূলা

৫। দিট্‌ঠা বা যে ব অদিট্‌ঠা, যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা ব সম্ভবেসী ব, সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

৬। ন পরো পরং নিকুব্বেথ, নাতিমঞ্ঞেঞথ কত্থচি ন কিঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা, নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুকখমিচ্ছেয্য।

৭। মাতা যথা নিয়ং পুত্তমায়ুসা একপুত্তমনুরক্খে,
এবং পি সব্বভূতেসু, মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

৮। মেত্তং চ সব্বলোকস্মিং, মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ং চ, অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

৯। তিট্‌ঠং চরং নিসিন্নো ব, সয়ানো যাবতাস্স বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্য, ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

১০। *দিট্ঠিং চ অনুপগ্গম্ম, সীলবা দস্সনেন সম্পন্নো,*
কামেসু বিনেয়্য গেধং, ন হি জাতুগ্গব্ভসেয়্যং পুনরেতী'তি।

খুদ্দকপাঠপালি নিট্ঠিতা

নবম পাঠ

মৈত্রী সূত্র

১। শান্তপদ নির্বাণপ্রার্থীর যা করণীয় তা এরূপ- তিনি কর্ম-সম্পাদনে কুশল হন, সক্ষম, সরল, অতি সরল, সুবাধ্য, কোমল স্বভাবপরায়ণ, ও অভিমানশূন্য হন।

২। তিনি যথালাভে সন্তুষ্ট হন, মিতাহারী হন, অল্প কৃত্যে রত থাকেন, অল্পে তুষ্ট থাকেন, শান্ত-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান ও চাঞ্চল্যহীন এবং গৃহীদের প্রতি অনাসক্ত থাকেন।

৩। তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এমন কোন পাপাচরণ করবেন না যাতে অপর বিজ্ঞজন নিন্দা করার সুযোগ পান। (কাজেই) তাকে সব সময় কামনা করতে হয়- 'সকল প্রাণী সুখী হউক, ভয় মুক্ত হউক'।

৪। প্রাণী, সে ভীত বা অভীত, দীর্ঘ বা ছোট, বড় বা মহান, মধ্যম বা সূক্ষ্ম অথবা অণু বা স্থূল আকারের সকল শ্রেণীর হউক না কেন ---- (সকল (অশেষ) প্রাণী সুখী হউক।)

৫। প্রাণী সে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট, নিকটস্থ বা দূরস্থ, অথবা জাত বা অজাত যে আকার বা ধরনের প্রাণী হউক না কেন ---- সকল (অশেষ) প্রাণী সুখী হউক।

৬। অপরের অনিষ্ট কামনা করবে না। একে অন্যকেও প্রবঞ্চনা করবে না। অপরকে কখন কোথাও হেয় জ্ঞানে শত্রুতাবশত অপমান করবে না।

৭। মা যেমন তাঁর গর্ভজাত একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবনের বিনিময়েও রক্ষা করেন, ঠিক তেমনি সকল প্রাণীর প্রতিও অনুরূপ অপরিসীম মৈত্রীভাব পোষণ করবে।

৮। উপরে, নীচে, চারপাশে যত প্রাণী আছে তারা সবাই বাধাহীন, বৈরীহীন ও অপ্রতিদ্বন্দী হউক। এমন মৈত্রী-ভাব তাকে সব সময় পোষণ করতে হবে।

৯। দাঁড়ান অবস্থায়, চলমান অবস্থান, শয়নে ও উপবেশনে ঘুম না আসা অবধি ঐ মৈত্রীভাব স্মৃতি ও অধিষ্ঠান সহকারে পোষণ করতে হবে। আর্যগণ এ (বিহার)কে ব্রহ্মবিহার বলে থাকেন।

১০। শীলবান ও সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন স্রোতাপন্ন আর্য পুরুষ মিথ্যাদৃষ্টি ও কামেচ্ছাকে দমন করায় আর গর্ভাশয়ে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না (অর্থাৎ এমন পুরুষ শুদ্ধাবাস নামক ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন সেখানেই অরহত্বফল প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণের অধিকারী হন)।

ক্ষুদ্রকপাঠ পালি সমাপ্ত

ক্ষুদ্রক-পাঠ

(সংক্ষিপ্ত-পরিচয়)

পাঠ	মূল সাহিত্যিক স্রোত	দেশকের নাম
১। সরণত্তয়ং	বিনয়-পিটকে মহাবগ্গ	যশ-প্রমুখ ভদ্র-বংশীয় যুবকবৃন্দকে দীক্ষাদান-কালে বুদ্ধ এই পদ্ধতির প্রথম প্রচলন করেছিলেন।
২। দসসিক্খাপদং	,,	রাহুলকে প্রব্রজ্যা- দানকালে এটি বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞপ্ত হয়েছিল।
৩। দ্বত্তিংসাকারো	মজ্ঝিমনিকায়ে রাহুলোবাদ-সুত্ত	রাহুলের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত হয়।
৪। কুমার-পঞ্হা	,,	সোপাককে বুদ্ধ কর্তৃক কৃত প্রশ্ন।
৫। মঙ্গল-সুত্তং	সুত্তনিপাত-পেতবত্থু (মহামঙ্গল)	শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত হয়
৬। রতন-সুত্তং	সুত্ত-নিপাত	খরা-গ্রস্ত ও রোগ-গ্রস্ত বৈশালী-বাসীর দুর্দশা দমনের উদ্দেশ্যে বুদ্ধের নির্দেশে ভিক্ষু-সংঘ কর্তৃক আবৃত্ত হয়।
৭। তিরোকুড্ড-সুত্তং	,,	বেণুবন বিহারে অবস্থান কালে মগধরাজ বিম্বিসারের জ্ঞাতি-প্রেতাত্মীয়গণের উদ্দেশ্যে পুণ্যদান-কালে এটি বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত হয়।
৮। নিধিকণ্ড-সুত্তং	জাতক-অট্ঠকথা ধম্মপদ- অট্ঠকথা	শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান কালে এক শ্রেষ্ঠীর বাসভবনে বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত হয়।
৯। মেত্ত-সুত্তং	সংযুক্তনিকায়	করণীয় মেত্তসুত্ত নামেও সুপরিচিত এ সূত্রটি অমানুষী ভয় হতে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ কর্তৃক শ্রাবস্তীতে দেশিত হয়।

পাঠ-সমূহে বর্ণিত বিষয়ভেদ-সূচক ছক

ক্রমিক সংখ্যা পাঠ	বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ	বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনে শীল মাহাত্ম্য	বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনে দান মাহাত্ম্য	পারিবারিক কর্তব্য	সামাজিক কর্তব্য	প্রাণী জগতের পরিচয়	পরিত্রাণ বিশ্ব মৈত্রী-ভাবনা	বৌদ্ধ প্রেততত্ত্ব	পারলৌকিক কর্তব্য ও ভাবনার প্রকার	আধ্যাত্মিক কর্তব্য ও অশুভ কর্মস্থান	বৌদ্ধ ধর্ম কর্ম ও পুনর্জন্মবাদ	বৌদ্ধধর্ম সার পরিচিতি
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১১	১১	১২
১। সরণত্তয়	১											
২। দসসিকখাপদ		২										
৩। দ্বত্তিংসাকার										৩		
৪। কুমারপঞ্হা						৪					৪	৪
৫। মঙ্গল-সুত্ত			৫	৫	৫			৫			৫	
৬। রতন-সুত্ত						৬	৬	৬			৬	
৭। তিরোকুড্ড-সুত্ত								৭	৭		৭	
৮। নিধিকণ্ড-সুত্ত		৮						৮	৮		৮	
৯। মেত্ত-সুত্ত						৯	৯	৯		৯	৯	৯

তি-পিটক (পালি)

ত্রি-পিটক (বাংলা)

	পালি শব্দে				বিনয়-পিটক	সুত্ত-পিটক	অভিধম্ম-পিটক
			বাংলা অর্থ		বিনয়-পিটক	সূত্র-পিটক	অভিধর্ম-পিটক
১।	পারাজিকা পালি	বিভঙ্গ	প্রধান অপরাধ সংগ্রহ	বিশেষ বিভাজন			
২।	পাচিত্তিয় পালি		প্রায়শ্চিত্ত মূলক ছোট অপরাধ সংগ্রহ				
৩।	মহাবগ্গ পালি	খন্ধক	বড় ভাগ	স্কন্ধ			
৪।	চুল্লবগ্গ পালি		ছোট ভাগ				
৫।	পরিবার পালি		বিনয়ের সার সংক্ষেপ				
৬।	দীঘ-নিকায়		দীর্ঘ সূত্র সংগ্রহ				
৭।	মজ্ঝিম-নিকায়		মধ্যম সূত্র সংগ্রহ				
৮।	সংযুত্ত-নিকায়		মিশ্রিত সূত্র সংগ্রহ				
৯।	অঙ্গুত্তর-নিকায়		সংখ্যানুসারে সজ্জিত সূত্র সংগ্রহ				
১০।	খুদ্দক-নিকায়		ক্ষুদ্রক আকারের সূত্র সংগ্রহ				
	(ক) খুদ্দক-পাঠ		(ক) ক্ষুদ্র পাঠ			*	
	(খ) ধম্মপদ		(খ) সত্য পথ			*	
	(গ) উদান		(গ) প্রীতিপূর্ণ সংক্ষিপ্ত উদ্গার			*	
	(ঘ) ইতিবুত্তক		(ঘ) এইরূপে উক্ত-সূত্র			*	
	(ঙ) সুত্তনিপাত		(ঙ) বিশেষ সূত্র-সংগ্রহ			*	
	(চ) বিমানবত্থু		(চ) বিমান-কাহিনী			*	
	(ছ) পেতবত্থু		(ছ) প্রেত-কাহিনী			*	
	(জ) থেরগাথা		(জ) স্থবিরদের আত্মকথা			*	
	(ঝ) থেরীগাথা		(ঝ) স্থবিরাদের আত্মকথা			*	
	(ঞ) জাতক		(ঞ) বুদ্ধের অতীত জন্ম কথা			*	
	(ট) নিদ্দেস		(ট) নির্দেশমূলক বুদ্ধবাণীর সংগ্রহ			*	
	(ঠ) পটিসম্ভিদামগ্গ		(ঠ) বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান			*	
	(ড) অপদান		(ড) অর্হৎগণের জীবনী			*	
	(ঢ) বুদ্ধবংস		(ঢ) বুদ্ধগণের জীবনী			*	
	(ন) চরিয়া-পিটক		(ন) বোধিসত্ত্বগণের চর্যা সংগ্রহ			*	
১১।	ধম্মসঙ্গনী		ধর্ম সমূহের গণনা শ্রেণী বিভাজনমূলক পুস্তক				
১২।	বিভঙ্গ		বিশ্লেষণমূলক পুস্তক				
১৩।	কথাবত্থু		দার্শনিক মত-বিরোধ মীমাংসামুলক পুস্তক				
১৪।	পুগ্গলপঞ্ঞত্তি		ব্যক্তির শ্রেণী বিভাজনমূলক পুস্তক				
১৫।	ধাতুকথা		মূল তত্ত্বের আলোচনামূলক পুস্তক				
১৬।	যমক		যুগ্ম-বিষয়ক পুস্তক				
১৭।	পট্ঠান		প্রত্যয়-সম্পর্কে পুস্তক				

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নাম	ঃ	অধ্যাপক ড. ভিক্ষু সত্যপাল
পিতার নাম	ঃ	ঁবিনোদ বিহারী বড়ুয়া
মাতার নাম	ঃ	শ্রীমতি যুথিকা রাণী বড়ুয়া
জন্ম স্থান	ঃ	হলদিবাড়ী চা বাগান জলপাইগুড়ি (প. ব.)
জন্ম তারিখ	ঃ	০১. ০৩. ১৯৪৯

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ত্রিপিটক বিশারদ (স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত)
এম. ফিল., পি. এইচ. ডি. (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)

পেশা ঃ অধ্যাপনা, বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগ
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮১ হতে -)
বর্তমানেঃ বিভাগীয় প্রধান

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ (১) তেলকটাহগাথা (বঙ্গানুবাদ সহ)
(২) খুদ্দক-পাঠ (ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদ সহ
(৩) কচ্চায়ণ-ন্যাস (১ম ভাগ)
(৪) ধম্ম-সংগহ (১ম ভাগ)
(৫) বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর,
(৬) বৌদ্ধ ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ
(৭) শরণ-গ্রহণের পরম্পরা
(৮) বুদ্ধের দিব্যদৃষ্টি ও আজীবিক উপক
(৯) জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথা

গ্রন্থ-সম্পাদনা ঃ (১) 'মৈত্রী' স্মরণিকা (১৯৮২)
(বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, দিল্লী)
(২) 'ভিক্ষু-পরিবাস' স্মরণিকা (১৯৮৯)
(ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা)।
(৩) 'ধম্মচক্কং' স্মরণিকা (১৯৯৩ - ২০০৯)
(বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, দিল্লী)
(৪) 'The Buddhist Studies' –Journal of Department of Buddhist Studies University of Delhi, Delhi - 110007

প্রকাশনার অপেক্ষায় (গ্রন্থ ও নিবন্ধ) ঃ ১৮ টির পাণ্ডুলিপি তৈরী
(বাংলা, ইংরেজী ও পালি ভাষায়)

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

⁕ The Vows of Samantabhadra ⁕

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

⁕ The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ⁕

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《孟加拉文：KHUDDAKA-PATHA, 巴利文早晚課誦本》

財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.

এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
3,000 copies; April 2011
BA040 - 9262